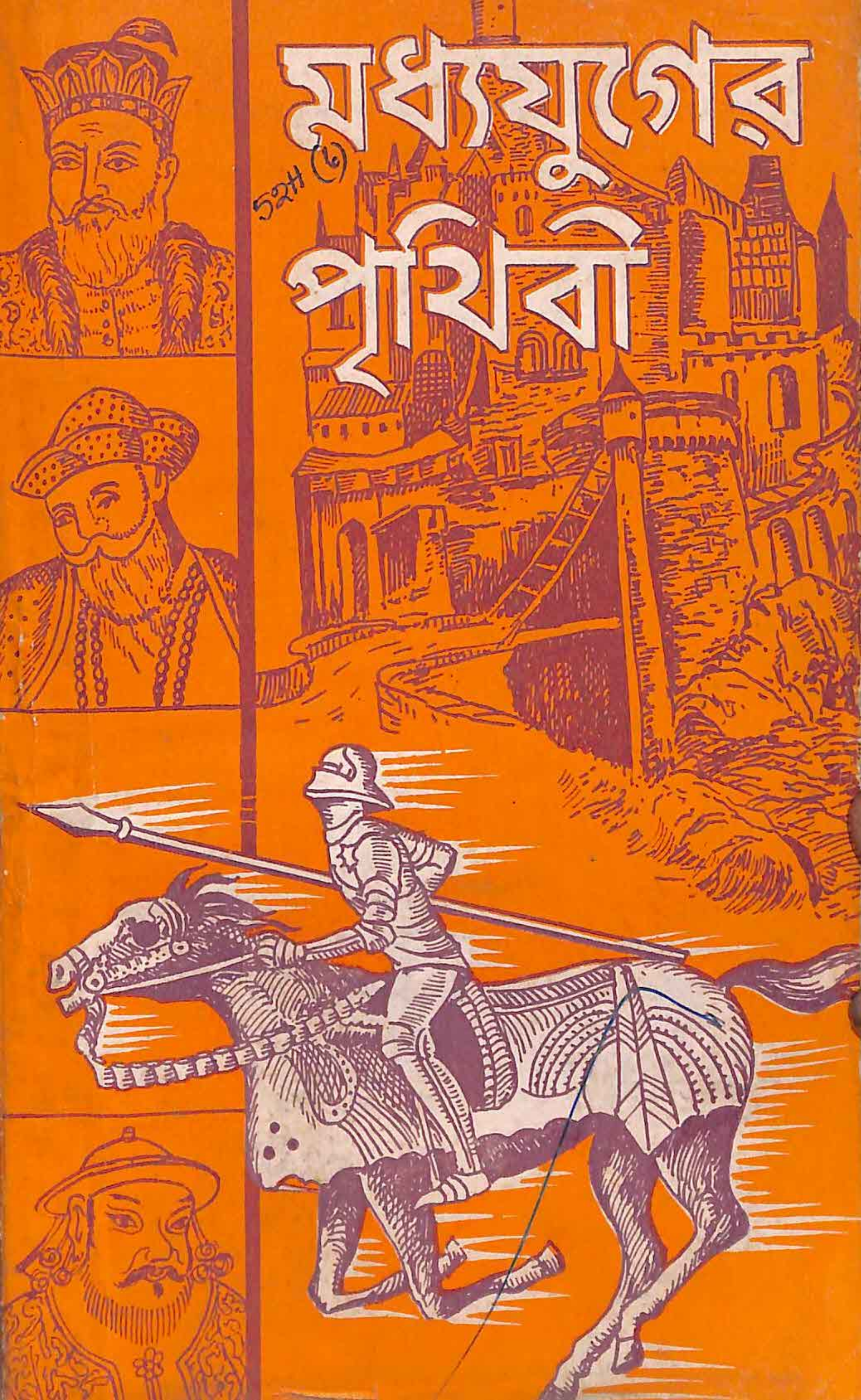
মধ্যযুগের পৃথিবী



পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক সপ্তম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত
[টি বি নং VII/H/81/৪৪ তাং 8. 1 81 দ্রষ্টব্য]

মধ্যযুগের পৃথিবী

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

অধ্যাপিকা স্নিগ্ধা সেন, এম. এ.
ইতিহাস বিভাগ,
সাবিত্রী গার্লস কলেজ, কলিকাতা।



॥ চলন্তিকা ॥
সাত, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯
দূরালাপনী-৩৪-৫৯১৪







প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮০,
সংশোধিত দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮০
তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১
চতুর্থ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

*



প্রকাশনায় : চন্দ্রিকার পক্ষে শ্রীহিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. (ডবল) রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ। মুদ্রণে : শ্রীপ্রণবেশ কুমার জানা, কমলা প্রেস, ৭/৮, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৩১

*

মূল্য : তের টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

এক নজরে মধ্যযুগের কালপঞ্জী

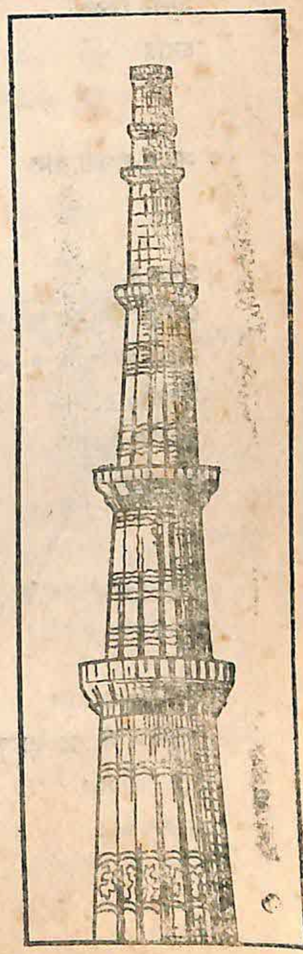


প্রথম অধ্যায় :

রোমের পতন : ৪৭৬ খ্রীঃ
গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান : ৪৮০-৪৯০ খ্রীঃ

দ্বিতীয় অধ্যায় :

অ্যালারিক কর্তৃক রোম আক্রমণ : ৪১০ খ্রীঃ
অ্যাটিলার ফ্রান্স আক্রমণ : ৪৫১ খ্রীঃ
অ্যাটিলার মৃত্যু : ৪৫৩ খ্রীঃ
গীজারিকের রোম লুঠ : ৪৫৫ খ্রীঃ
ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের অবসান : ৪৭৬ খ্রীঃ



তৃতীয় অধ্যায় :

ইউরোপের অন্ধকার যুগ : চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী
[illegible]াস : ৪৭৫-৫২৪ খ্রীঃ
ক্যাসিজেরিয়াস : ৪৮০-৫৭৩ খ্রীঃ

চতুর্থ অধ্যায় :

রোমের রাজধানী বাইজানটাইন নির্বাচন : চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধ
সম্রাট কনস্টানটাইনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ : ৩২৩ খ্রীঃ
নিসিয়ায় ধর্ম মহাসম্মেলন আহবান : ৩২৫ খ্রীঃ
সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল : ৫২৭-৫৬৫ খ্রীঃ
কনস্টানটিনোপলের পতন : ১৪৫৫ খ্রীঃ

পঞ্চম অধ্যায় :

মহম্মদের জন্ম : ৫৭০ খ্রীঃ
হিজরী সাল শুরু : ৬২১ খ্রীঃ
মহম্মদের মৃত্যু : ৬৩২ খ্রীঃ
হারুণ-অল-রশিদের রাজত্বকাল : ৭৭৬-৮০৯ খ্রীঃ

ষষ্ঠ অধ্যায় :

শার্লামানের পিতৃরাজ্য প্রাপ্তিঃ	:	৭৬৮ খ্রীঃ
পোপ কর্তৃক শার্লামানের অভিষেক :		৮০০ খ্রীঃ
শার্লামানের মৃত্যু	:	৮১৪ খ্রীঃ
ভার্দুনের সন্ধি	:	৮৪৩ খ্রী:
ক্লুনির মঠের প্রতিষ্ঠা	:	৯১০ খ্রীঃ
অভিষেকের দ্বন্দ্ব	:	১০৭৫ খ্রীঃ
প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	:	১১১০ খ্রীঃ
ওয়ার্মসের সন্ধি	:	১১২২ খ্রীঃ
কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা	:	১২০৯ খ্রীঃ
দান্তে	:	১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ
রজার বেকন	:	১২৯৩ খ্রীঃ
চসার	:	১৪০০ খ্রীঃ

সপ্তম অধ্যায় :

সামন্ত প্রথার কাল	:	৬০০-১২০০ খ্রীঃ

অষ্টম অধ্যায় :

প্রথম ক্রুসেড	:	১০৯৫ খ্রীঃ
জেরুজালেমের অধিকার	:	১০৯৯ খ্রীঃ
নাইট হসপিটালস-এর প্রতিষ্ঠা	:	১১২০ খ্রীঃ
দ্বিতীয় ক্রুসেড	:	১১৪৭ খ্রীঃ
তৃতীয় ক্রুসেড	:	১১৮৯-১১৯২ খ্রীঃ
চতুর্থ ক্রুসেড	:	১২০২ খ্রীঃ

নবম অধ্যায় :

মধ্যযুগে নগরগুলির উদ্ভবের কাল	:	১১দশ-১৩দশ খ্রীঃ

দশম অধ্যায় :

তাং রাজত্বকাল	:	৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ
হিউ-এন সাঙের ভারত আগমণ	:	৬২৯ খ্রীঃ
সুং রাজবংশ	:	৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ
চেঙ্গিস খাঁন	:	১১৭৫-১২১৭ খ্রীঃ

ছেংগিস খাঁর পিকিং আক্রমণ	:	১২১৪ খ্রী
চেংগিস খাঁর মৃত্যু	:	১২২৭ খ্রীঃ
কুবলাই খান	:	১২৬০-১৩৯২ খ্রীঃ
কুবলাই খাঁর মংগোল নেতা হওয়া	:	১২৬০ খ্রীঃ
কুবলাই খাঁর জাপান আক্রমণ	:	১২৮১ খ্রীঃ
কুবলাই খাঁর মৃত্যু	:	১৩৯২ খ্রীঃ
মারকোপোলোর ভ্রমণ শুরু	:	১২৭১ খ্রীঃ
মারকোপোলোর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	:	১২৯৫ খ্রীঃ
মারকোপোলোর কাহিনী রচনা	:	১২৯৮ খ্রীঃ
জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার	:	আনুমানিক ষষ্ঠ খ্রীঃ
শোগুণ পদের প্রতিষ্ঠা	:	১১৯২ খ্রীঃ
নারা শহরে রাজধানী স্থাপন	:	৭১০ খ্রীঃ
তোকুগাওয়ার শোগুণ পদ লাভ	:	১৬০৩ খ্রীঃ
শোগুন প্রথার বিলোপ	:	১৮৬৮ খ্রীঃ

একাদশ অধ্যায়ঃ

দিল্লীর নগরের পত্তন	:	৭৩৬ খ্রীঃ
দ্বিতীয় পুলকেশী হাতে হর্ষবর্ধনের পরাজয়	:	৬৪২ খ্রীঃ
পাল বংশের রাজত্বকাল	:	অষ্টম—দ্বাদশ শতাব্দী (আনুঃ)
সেন বংশের রাজত্ব শুরু	—	দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (আনুঃ)
মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ প্রথম অভিযান	:	১২০০ খ্রীঃ
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন	:	৫৫০ খ্রীঃ
ভারতের হূণ আক্রমণের সূচনা	:	৪৫৮ (আনুঃ)
যশোধর্মন	:	৫৩০-৫৪০ খ্রীঃ
হর্ষবর্ধন	:	৬০৬ খ্রীঃ
পাল প্রতিহার রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্ব	:	৭৮৩-৮৮৫ খ্রীঃ
শশাঙ্ক	:	৬০৬-৬৩৭ খ্রীঃ

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ

অতীশের তিব্বত গমন	:	৯৮০ খ্রীঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায় :

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ কাল	:	৯৭৭-১০৩০ খ্রীঃ

দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ	: ১১৮২ খ্রীঃ
ইলতুৎমিসের সিংহাসনারোহণ	: ১২৬৬ খ্রীঃ
আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয়	: ১৩০৮-১৩১২ খ্রীঃ
মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল	: ১৩১৬-১৩৫১ খ্রীঃ
মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী অপসারণ	: ১৩২৬-১৩২৭ খ্রীঃ
সৈয়দ বংশ	: ১৪১৪-১৪৫৯ খ্রীঃ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	: ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ
কবীর	: ১৪৪০-১৫১৮ খ্রীঃ
গুরু নানক	: ১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ

ভূমিকা

পশ্চিমবংগ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সপ্তম শ্রেণীর পাঠক্রম অনুযায়ী এই ইতিহাস বইটি লেখা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় এবং গল্পের ভংগীতে ইতিহাসের কাহিনীগুলি ছাত্রদের বোধগম্য করার চেষ্টা করেছি। বইয়ের প্রথমে এক নজরে মধ্যযুগের কালপঞ্জী আছে। মানচিত্র এবং ছবির সাহায্যে ঘটনাগুলি আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের প্রথমে বিষয় সংকেত ও শেষে সংক্ষিপ্তসার আছে এবং বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Questions)। আর পরিশিষ্টে আছে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক বর্ষ-পঞ্জী। প্রবহমান কালের পটভূমিকায় ব্যক্তি ও ঘটনাকে উপস্থিত করে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে সরল ভাবে বোধগম্য করার কাজটা মোটেই সহজ নয়। ইতিহাসের মৌল বোধকে যাতে ছাত্রছাত্রীরা ধরতে পারে তার চেষ্টা এখানে করা হয়েছে।

"যাদের দেশের ইতিহাস নেই তাদের কিছুই নেই। ·· একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতটাকে টেনে রাখে নীচু হতে দেয় না·· " এই কথার মূল্যায়ণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

কলিকাতা/ ১৩৮৪ স্নিগ্ধা সেন

SYLLABUS IN HISTORY

For Class VII

HISTORY OF MEDIEVAL CIVILISATIONS

1. *Meaning of the Medieval.*
   (a) From overthrow of the last Roman Emperor in 476 A. D. to the rise of new society, new State, new learning, new economic Patterns.
   (b) In India—from the end of the Gupta Era (although 'Fedural relations had started from the 5th century).
   (c) The time period in both cases—roughly 5th century to 15th century A. D.
   (d) Periodisation is arbitrary because of gradual transition, in some respect the old merging into the middle ages.
   (e) Middle ages—not the same period everywhere.
   (f) No single pattern. Unequal and varied developments.
2. *The Middle Ages in the West :*
   (a) Advent, pressure of the Huns upon Germanic Tribes—their migration into the Western part of the Roman Empire—fall of the Empire(476 A.D.) Survival of Roman Law and Roman idea of imperial unity.
   (b) A short reference to Alaric, Atilla Gieseric.
   (c) Social, political and religious life of the migrants, (a brief account only of) their settlements in the imperial territories—mix-up with Roman population. Christian influence upon the settlers.
3. *The myth of 'dark age' in Europe :*
   4th to 7th Century—not 'dark' learning was kept alive in monasteries—ecclesiastical concept of of right and wrong functioned as a civilising influence :
4. *The Byzantine Civilisation :*
   (a) Constantine founds Constantinople and makes Christianity the official religion of Byzantium.
   (b) Justinian's efforts to establish unified empir)e without

details about wars). Justinian's Law Code, its importance; patronage of architecture and painting.

(c) Importance of Byzantium as a centre of trade and commerce, presever of Culture (Literature, Philosophy, Science).

5. *Islam and its impact* :

(a) The Arabs—land and people. The prophet and his teachings ; Factors which facilitated the spread of Islam : The Caliphs, the Arab Empire ; Cordova ; How Europe reacted to the achievements of Islam ; Arab contributions to culture, arts and sciences, scholarship. Some scholars.

6. *Western Europe in Medieval Period* (800—1200 A.D. approx)

(a) Charlemagne—revival of the Holy Roman Empire

(b) Monasteries—Monks and nuns

(c) Investiture issue (Reference only)

7. *Feudalism in Medieval Europe* :

(a) Feudalism :

(b) Manorial System :

8. *The Crusades* : (1st, 3rd, 4th)

Motives—Impact upon society and culture—new towns and trade centres (Italy in particular), cottage industries from agriculture (11th & 12th centuries).

9. *Growth of Towns*—Role of Crusades—Guilds in towns—Their activities—a short account of life in towns. Town autonomy by royal charter ; origin of the term 'Bourgeois'.

10. *The Far East in the Middle Ages* :

(i) China in Medieval period (from early 7th century to 14th Century).

(a) The T'ang period (618—907 A. D.) Re-unification of China and recasting the laws : Education, learning, litearture (Poetry) : Tea, printing arts.

Promotion of trade, commerce and agriculture. Buddhism in China. Chinese civilisation spread to Japan, Korea, Annam. China—a model of emulation.

Hiuen Tsang's visit to India and his return—impact.

(b) The Sung period (960—1280)—Important experiments—State control of Commerce, State loan to farmers, property Tax.—Education and Culture.

(c) The Yuan period (1280—1368): Tne Mongols: Kublai Khan (Tibetan Buddhism), and the account of Marcopolo.

(ii) *Japan in Medieval period*:

(a) Society and Feudal economy in early medieval times Supremacy of Mikado: Close links with China. Resistance of "Great Families".

Mikado combined the office of Shinto High Priest and absolute sovereign. Yet the growing power of hereditary clan-families and enrichment of Buddhist Orders weakened the central authority. The Shogunate. The Samurai, Japanese Chivalry (Bushido).

11. *India in the Middle Ages*:

(a) After the Guptas (5th—7th century). Hun incursions from 458 (occupation of Persia, Kabul, North-Western India) (historical importance of the Huns,)

Break up of the Gupta Empire; Age of Harshavardhan Shrinking of the ideal of imperial unity to only Uttara-pathanath: Hiuen Tsang's travels—his account; Nalanda—main features of the University.

(d) *Post-Harshavardhan period* (8th to 12th century):

After Harshavardhan—rise of smaller States: The 'Raj-puts': The Feudal Clannish principalities of Rajputana Pala, Pratihara, Rastrakuta contest (reference only)—un-ability to establish a united empire; smaller kingdom and vassals.

(c) Bengal: Sasanka, Life and Society under the Palas and Senas—Religion and learning (Vikramsila and Uddanda-pur).

(d) South India—The Chalukyas of Badami and Pallavas of Kanchi, their contributions to Art and Architecture—Maritime activities of Cholas.

12. *India's foreign contacts* :

By land—Mahayana Buddhism in Central Asia, thence to China (Khotan ruins, Hiuen Tsang's evidence) ; Tibet,—(Atisa Dipankar).

by Sea—Settlements and cultural influence in South East Asia—Subarnabhumi—Yashodharpur and Angkorvat, Angkorthom—Malay, Java—Barobudur.

13. *The Sultans of Delhi* (1206 to 1526 A. D.)

14. Towards the end of the Medieval era (14th & 15th) Centuries Fall of Constantinople ; its impact on the Renaissance which had already started in the West.

*Features of the Renaissance era—Spirit of enquiry and reasoning widening of frontiers of knowledge, scientific dicoveries based on "obsecured facts", geographical discoveries—its outcome.

*National States France, England, Portugal, Spain, Struggle for National Freedom (Dutch).

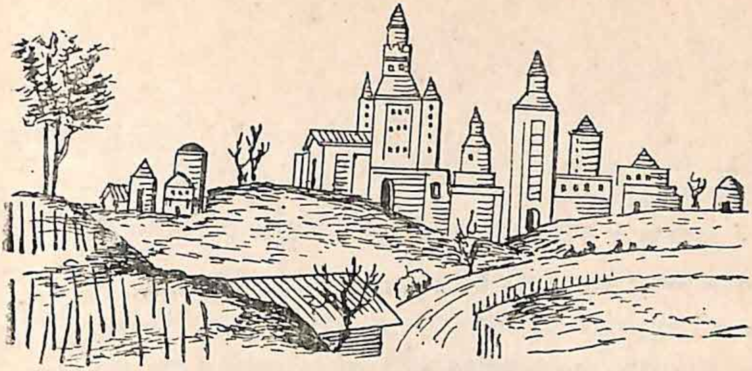
*Expansion of Europe.

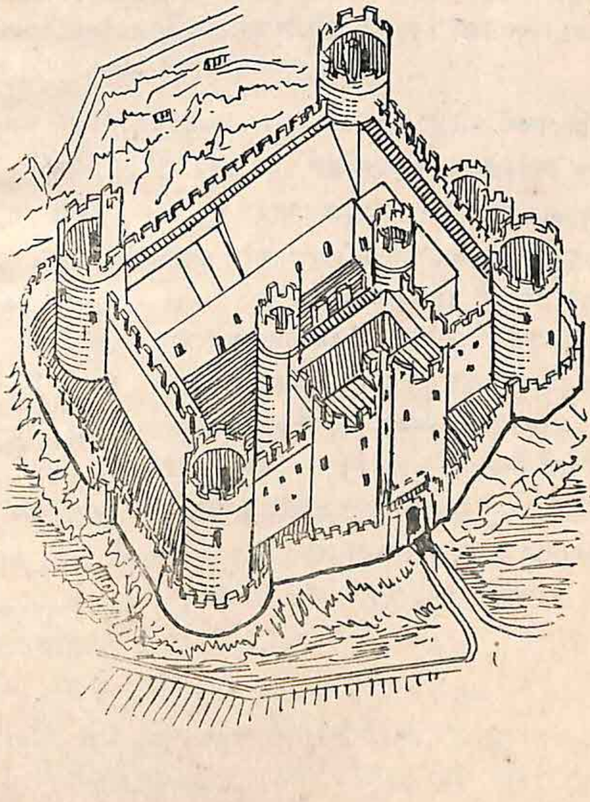
*Old Order Vs. New Order—The English revolt.

Topics with asteriske should only be used as reference, as a conclusion to the old era and introduction of a new era.

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় :	মধ্যযুগের সংজ্ঞা :	১
দ্বিতীয় অধ্যায় :	ইয়োরোপের মধ্যযুগের সূচনা :	৪
তৃতীয় অধ্যায় :	ইয়োরোপের অন্ধকার যুগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা :	১১
চতুর্থ অধ্যায় :	বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা :	১৪
পঞ্চম অধ্যায় :	ইসলাম সভ্যতা ও তার প্রভাব :	২২
ষষ্ঠ অধ্যায় :	মধ্যযুগের পশ্চিম ইয়োরোপ :	৩২
সপ্তম অধ্যায় :	মধ্যযুগের ইয়োরোপের সামন্ততন্ত্র :	৪৪
অষ্টম অধ্যায় :	ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ :	৫৭
নবম অধ্যায় :	মধ্যযুগের নগর নাগরিক :	৬১
দশম অধ্যায় :	মধ্যযুগের সুদূর প্রাচ্য :	৬৬
একাদশ অধ্যায় :	মধ্যযুগের ভারতবর্ষ :	৮৩
দ্বাদশ অধ্যায় :	বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের যোগাযোগ :	৯৯
ত্রয়োদশ অধ্যায় :	ভারতের সুলতানী আমল :	১০৬
চতুর্দশ অধ্যায় :	অবসানের পথে মধ্যযুগ :	১১৪
পরিশিষ্ট :		
	(১) শতাব্দী পরিক্রমা :	
	(২) পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর বর্ষ ও ঘটনাপঞ্জী :	





প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের সংজ্ঞা

[মধ্যযুগ কাকে বলে। মধ্যযুগের সূচনা, আরম্ভ ও অবসান]

মধ্যযুগ বলতে সাধারণতঃ বোঝায় পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর কাল। পঞ্চম শতাব্দীতে ইয়োরোপের অখণ্ড রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এর পরেও রোম সাম্রাজ্যের একটি শাখা পূর্ব দিকে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য নাম নিয়ে টিকে ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অটোম্যান তুর্কী জাতির আক্রমণে এই সাম্রাজ্যের পতন হয়। রোম সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন এইভাবে মুছে গেলেও পঞ্চদশ শতাব্দীতেই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার হয়েছিল ও চিন্তার জগতের নূতন প্রেরণার জন্ম হয়েছিল। তার থেকেই আধুনিক জগতের সূচনা। তাই পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী হল পৃথিবীর ইতিহাসে মধ্যযুগ।

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ রোমান সম্রাট রমুলাস রোমান সেনাবাহিনীর এক 'বর্বর' অধিনায়ক ওডোয়াচার কর্তৃক পরাজিত হন। সমসাময়িক ভারতবর্ষেও তখন হূণ আক্রমণের ফলে এবং অন্যান্য কারণে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে যাচ্ছিল। এই দুই সাম্রাজ্য ছিল প্রাচীন সভ্যতার চরম বিকাশের ফল। অতএব তাদের পতনের সাথে সাথে প্রাচীন সভ্যতাও বিলীন হয়ে যায়। অবশ্য গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ভেঙে যাবার অনেক আগে থেকেই—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শুরু থেকেই—ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র অস্পষ্টভাবে শুরু হয়েছিল। সামন্ততন্ত্রের আগমন, বিস্তার ও তার পতনই হল মধ্যযুগের সভ্যতার কেন্দ্রীয় বিষয়। রাজার অখণ্ড ক্ষমতা বিলীন হয়ে গিয়ে ছোট ছোট আঞ্চলিক প্রভুদের আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা ও জমিকে কেন্দ্র করে দেশের অর্থনীতি গড়ে ওঠার নামই হল সামন্ততন্ত্র। পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে এই দুটি ঘটনা মানুষের জীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাই সেই সময়টা হল পৃথিবীর ইতিহাসে মধ্যযুগ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কালের পরিমাপে মধ্যযুগ হল প্রায় এক হাজার বছর। পৃথিবীর সর্বত্র এই মধ্যযুগ এক সাথে শুরু হয়নি, এক সাথে শেষও হয়নি। মধ্যযুগে পৃথিবীতে অনেক সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল যেমন এশিয়া, ইয়োরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে আরব সাম্রাজ্য, চীনে তাং সাম্রাজ্য, এশিয়াতে মোঙ্গোল সাম্রাজ্য ইয়োরোপ ও এশিয়া জুড়ে অটোম্যানস সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষে তুর্ক-আফগান

সাম্রাজ্য। এই সব সাম্রাজ্যের আবির্ভাব, পতন, তাদের ভেতরের গঠন ও ইতিহাস এক নয়। মধ্যযুগ যেমন কোন বিচ্ছিন্ন যুগ নয়, সেইরকম থেমে থাকার যুগ নয়। মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় জিনিস হল গতি। মধ্যযুগের ভেতরেও এই গতি ছিল। এই গতি ছিল বলেই মধ্যযুগেও সভ্যতার অগ্রগতির ধারাটি অক্ষুণ্ণ ছিল। অনেক সময়েই মনে হয় যে প্রাচীন যুগের গৌরবের পাশে মধ্যযুগ ম্লান আর আধুনিক যুগের বৈভবের পাশে তা নিষ্প্রভ কিন্তু এ কথাও ঠিক নয়। মধ্যযুগ পৃথিবীর দুটি বড় ধর্ম—বৌদ্ধ ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম—জন্মলাভ করেছিল। মধ্যযুগেই পৃথিবীতে মুদ্রণশিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল। এই যুগেই পৃথিবীতে ভেনিস, জেনোয়া, প্যারিস, হামবুর্গ, মিউনিক, মস্কো প্রভৃতি শহরের উত্থান হয়েছিল। এই সময়েই হিউ-এন্-সাঙ, মার্কোপোলোর মত পর্যটক দেশ দেশান্তর পরিক্রমা করেছিলেন। কলম্বাস, ভাস্কো ডা-গামার মত দেশ আবিষ্কারকও এই যুগে জন্মেছিলেন। তা ছাড়া মধ্যযুগে সারা পৃথিবীতে অনেক পণ্ডিত ও মনীষী জন্মেছিলেন এবং অনেক শিল্পকলারও সৃষ্টি হয়েছিল। সব মিলিয়ে মধ্যযুগকে অসাড় বলা যাবে না। দেশ দেশান্তরে যে নব নব সৃষ্টি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা মধ্যযুগকে এমন এক সমারোহময় মহিমা দিয়েছে যার আলোতে মধ্যযুগের ইতিহাস সমুজ্জ্বল। মধ্যযুগ আসলে প্রাচীন এবং বর্তমান যুগকে একটি ধারাবাহিকতার মধ্যে সংযুক্ত করেছে। তাই এই যুগকে প্রাচীন যুগের পরিণতি, আর বর্তমান যুগের পটভূমিকা বলা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার—পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী এই এক হাজার বছর কালকেই সাধারণতঃ মধ্যযুগ বোঝায়। পঞ্চম শতাব্দীতে ইয়োরোপে অখণ্ড রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সাময়িক ভারতবর্ষেও একটি বড় সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল—তার নাম গুপ্ত সাম্রাজ্য। এই দুই সাম্রাজ্য ছিল প্রাচীন সভ্যতার চরম বিকাশের ফল। সামন্ততন্ত্রের আগমন, বিস্তার ও তার পতনই হল মধ্যযুগের সভ্যতার কেন্দ্রীয় বিষয়। পৃথিবীর সর্বত্র এই মধ্যযুগ একসাথে শুরু হয়নি, একসাথে শেষ হয়নি।

মধ্যযুগে পৃথিবীতে অনেক সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই সব সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভিন্ন, আবার সবকটিরই চরিত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক। প্রাচীন সভ্যতা থেকে আধুনিক যুগে আসতে গিয়ে মধ্যযুগকে অতিক্রম করে আসত হয়েছে। তাই মধ্যযুগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগ কাকে বলে? ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূচনা কিভাবে হয়েছিল?

২। ইয়োরোপে মধ্যযুগ কবে আরম্ভ হয়েছিল এবং কবে শেষ হয়েছিল? ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপে মধ্যযুগের মূল বিষয় কি?

৩। মধ্যযুগের পৃথিবীর কয়েকটি বড় সাম্রাজ্যের নাম কর। এই সমস্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসের মূল ধারা কি এক ?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। মধ্যযুগ বলতে কি কোন সময়কে বোঝায় ?

২। শেষ রোমান সম্রাটের নাম কি ছিল ?

৩। মধ্যযুগের কয়েকটি সাম্রাজ্যের নাম বল ?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১। শেষ রোমান সম্রাট বর্বর অধিনায়ক———কর্তৃক পরাজিত হন।

২। সামন্ততন্ত্রের আগমন, —— ও তার পতনই হল মধ্যযুগের সভ্যতার ——— বিষয়।

৩। কালের পরিমাপে মধ্যযুগ হল প্রায় —— বছর।

৪। পঞ্চম থেকে — শতাব্দীর মধ্যে এই ঘটনা মানুষের জীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইয়োরোপে মধ্যযুগের সূচনা

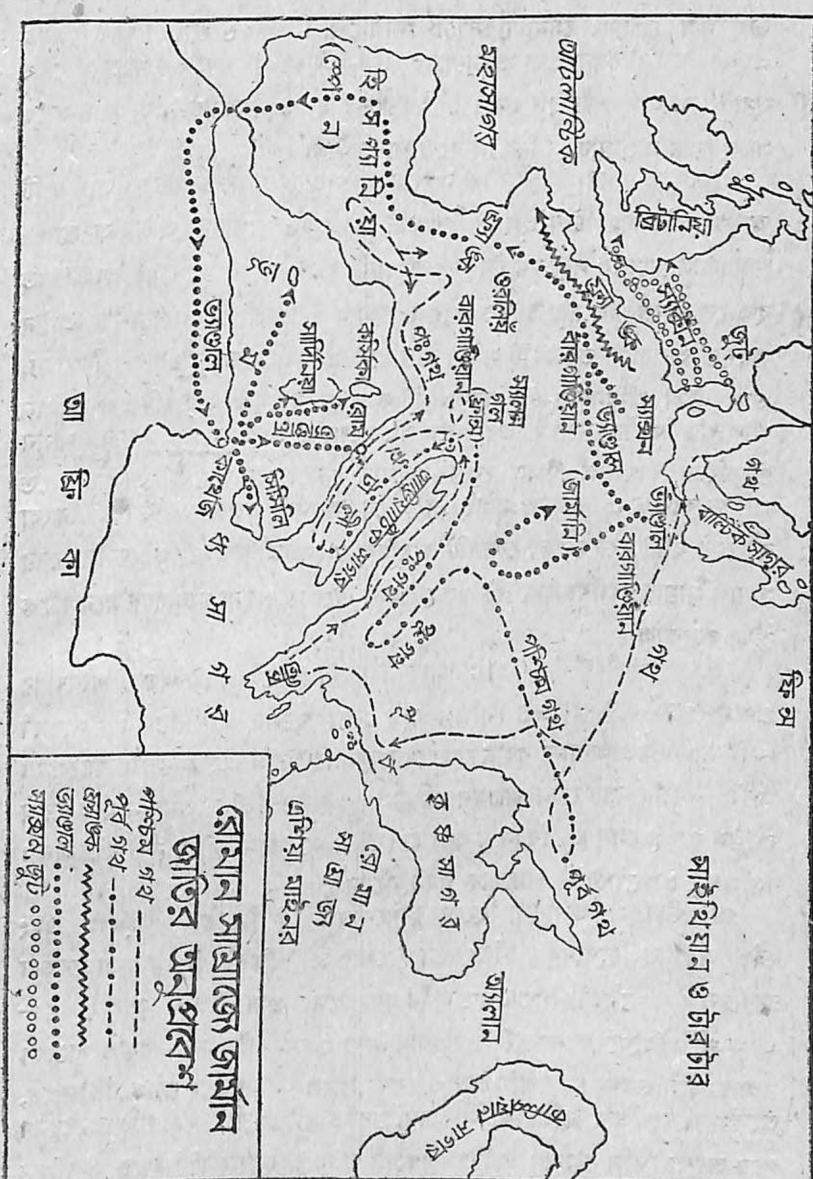
[বর্বর আক্রমণ ও রোমান সাম্রাজ্যের পতন ; রোমান সাম্রাজ্যের দান ; কয়েকজন 'বর্বর' নেতা ; অ্যালারিক, অ্যাটিলা ; গীজারিক ; রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে জার্মান বসতি ; বৈদেশিক জাতি-গুলির জীবনযাত্রা]

রোম সাম্রাজ্য ছিল প্রাচীন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য। ভূমধ্যসাগরকে মাঝখানে রেখে ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী, গ্রীস হয়ে এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, আরব ভূমির কিছুটা নিয়ে তুর্কী, সিরিয়া ও মিশর পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইয়োরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশ জুড়ে এই সাম্রাজ্য প্রায় পাঁচশ বছর (খ্রীঃ পূঃ ২৭—খ্রীষ্টাব্দ ৪৭৬) অখন্ডভাবে টিকে ছিল। গ্রীসের সামান্য অঞ্চলে গ্রীক ভাষা ছাড়া সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অঞ্চলে ল্যাটিন ভাষা প্রচলিত ছিল। এক ভাষা, এক আইন ও এক শাসনপদ্ধতি এই সাম্রাজ্যকে এমন এক ঐক্য ও সংহতি দিয়েছিল যা পরবর্তী কালে ইয়োরোপে আর দেখা যায়নি।

বর্বর আক্রমণ ও রোমান সাম্রাজ্যের পতন :—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে থেকে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে থাকে। 'বর্বর' নামে অভিহিত অতিশয় শক্তিশালী জার্মান জাতির দুটি ধারা সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানা ভেঙে সাম্রাজ্যের ভেতরে ঢুকে পড়ে। একটি ধারা পূর্ব দিক থেকে এসেছিল। এই ধারার মধ্যে ছিল গথ, ভ্যান্ডাল, জেপিড, লম্বার্ড ও বার্গান্ডিয়ানরা। আরেকটি শাখা পশ্চিম দিক থেকে এসেছিল। এই ধারায় মধ্যে ছিল ফ্র্যাঙ্ক, গথদের আরেকটি শাখা, অ্যাঙ্গেলস্ ও স্যাক্সনরা। পরবর্তী কালে পশ্চিম গথরা ভিজিগথ ও পূর্ব গথরা অস্ট্রোগথ নামে অভিহিত হয়।

খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মান জাতিগুলি রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের বাইরে অবস্থান করলেও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে খুব প্রবেশ করেনি। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে হূণ নামে জার্মানদের থেকেও দুর্ধর্ষ আরেকটি জাতির আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে জার্মানরা সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। হূণরা ছিল মোঙ্গোল জাতির একটি শাখা। মধ্য এশিয়াতে ছিল তাদের আদি নিবাস। তারা ছিল কুৎসিৎ, খর্বাকৃতি, পীতবর্ণ, আচারহীন ও নৃশংস। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে চীনের সীমান্ত

থেকে এসে হূণরা কাস্পিয়ান সাগরের তীরে বসতি স্থাপন করে। সেইখান থেকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে অস্ট্রোগথ, ভিজিগথ প্রভৃতি জাতিগুলি পশ্চিমে



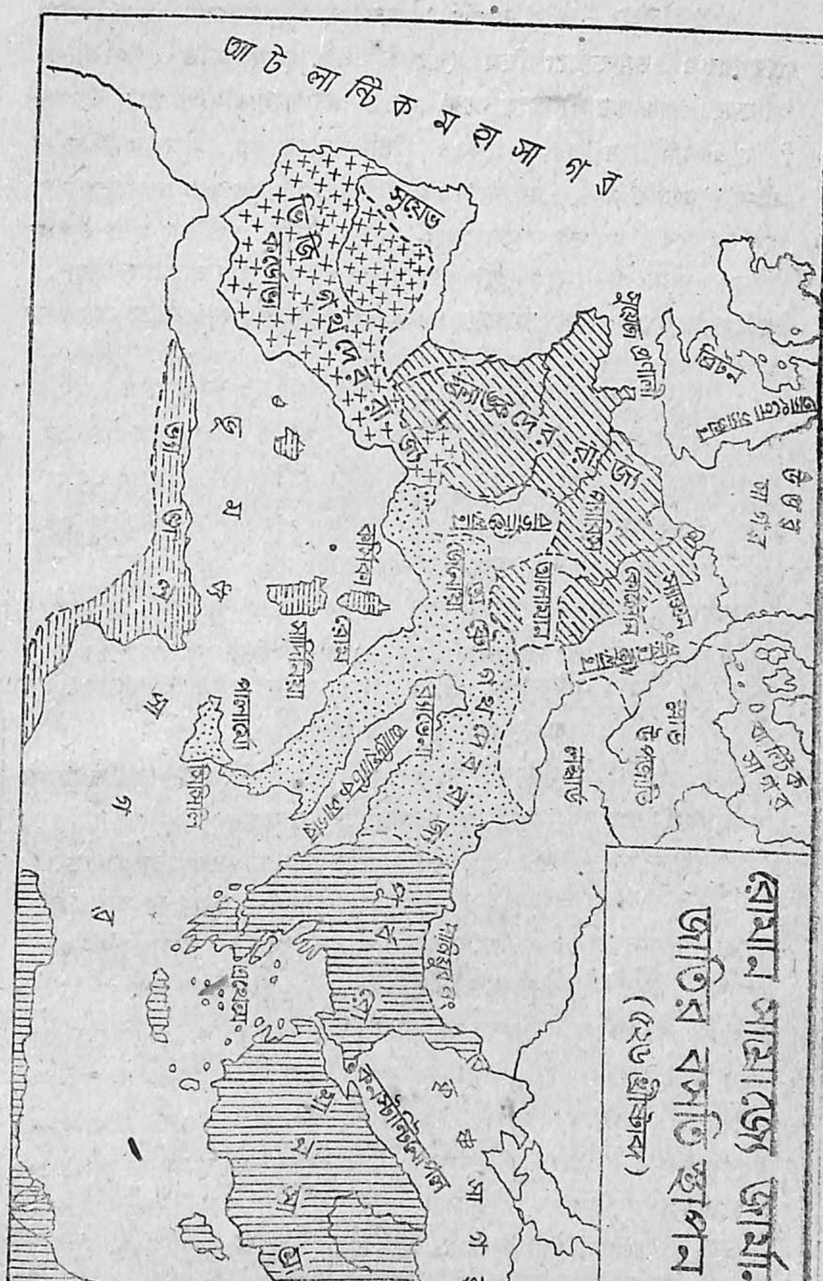
সরে যেতে থাকে। ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিজিগথরা হূণদের হাতে পরাজিত হলে প্রায় আশি হাজার 'বর্বর' জার্মান রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বিপুল

সংখ্যক 'বর্বর' মানুষের অনুপ্রবেশ ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতি, আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি ভেঙ্গে যেতে থাকে। ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি যুদ্ধে রোমানরা জার্মানদের হাতে পরাজিত হয়। তা সত্ত্বেও রোমান সাম্রাজ্য টিকে ছিল। জার্মানরা রোমান সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই রকম একজন 'বর্বর' সৈন্যাধ্যক্ষ ওডোয়াচার (Odoacer) কর্তৃক রোমের শেষ সম্রাট রমুলাস পরাজিত হন। 'বর্বরদের' হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার সাথে সাথে রোমান সাম্রাজ্যও বিলীন হতে শুরু করল।

রোমান সাম্রাজ্যের দান :—রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও তার দুটি আদর্শ দীর্ঘকাল টিকেছিল। প্রথমটি হল এক সুসংগঠিত আইন ব্যবস্থা—রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অবদান। জনগণের মনে এই আইন এত বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তীকালে ইয়োরোপের মহাদেশীয় আইন ব্যবস্থার অন্তরালে তা একটি সক্রিয় শক্তি হয়ে রইল। রোমান সাম্রাজ্য অবিভাজ্য, তার ঐক্য অবিনশ্বর এই ধারণাও টিকে রইল বহুকাল। এটি হল রোমান আদর্শের দ্বিতীয় ফসল। এর আগে যখন স্পেনে ও আফ্রিকায় জার্মান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন কেউ ভাবেনি যে রোমান সাম্রাজ্য তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। এখনও সবাই ভাবল যে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছে, কিংবা শাসনের ঘাঁটি সরে গেছে, যেমনটি হয়েছিল কন্‌স্টান্‌টাইন ও থিওডোসিয়াসের সময়। সাম্রাজ্য অবিভাজ্য, এই রকম একটা ঐক্যের ধারনা মানুষের মনে টিকে রইল বহুকাল।

কয়েকজন 'বর্বর' নেতা : অ্যালারিক :—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে পূর্বদিকে অবস্থিত ভিজিগথদের নেতা ছিলেন অ্যালারিক। সাহসী ও নিষ্ঠুর হলেও অন্যান্য বর্বর নেতাদের তুলনায় তিনি অনেক সভ্য ছিলেন। তিনি একাধিকবার রোম আক্রমণ করেন। একবার তিনি তিনদিন ধরে রোম লুণ্ঠন করেছিলেন। তিনি অবশ্য কোনদিন খ্রীষ্টান গির্জা নষ্ট করেননি। তিনি ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

অ্যাটিলা :—অ্যাটিলা ছিলেন হূণনেতা। তিনি ছিলেন নৃশংস এবং তাঁর অধীনস্থ হূণদের 'বীভৎসতার থেকেও ভয়ঙ্কর' এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় উনিশ বছর (৪৩৫-৪৫৩ খ্রীঃ) হূণদের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এশিয়া থেকে রাইন নদী পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি গল ও স্পেন ধ্বংস করেন এবং ফ্র্যাঙ্ক, ভিজিগথ, অস্ট্রোগথ, জেপিড, রুগিয়ান, সিরিয়ান, প্রভৃতি জাতিগুলিকে পরাজিত করেন। পরে অবশ্য তিনি রোমান ও ভিজিগথদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। তার নৃশংসতার কাহিনী বহুদিন জার্মানী ও স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার মানুষদের মনে ভীতির সঞ্চার করত।


রোমান সাম্রাজ্যে জার্মান
জাতির বসতি স্থাপন
(৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
বাল্টিক সাগর
কৃষ্ণ সাগর

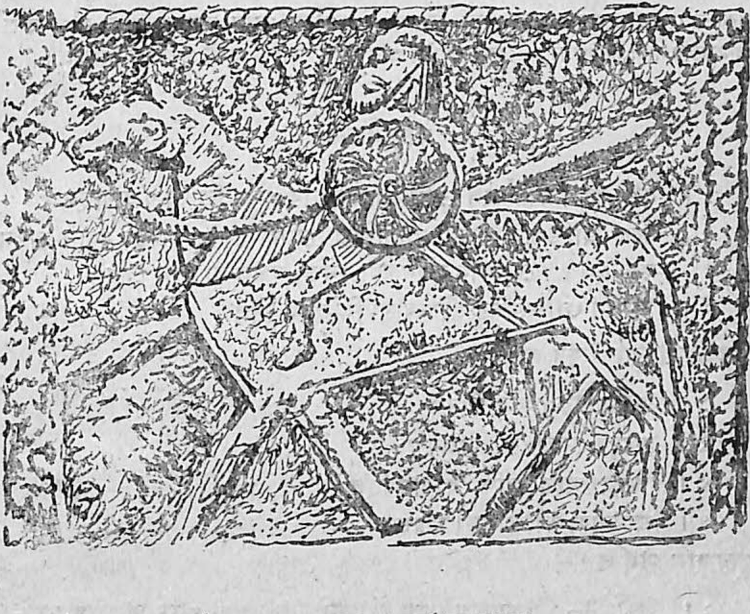
গীজারিকঃ—খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভ্যান্ডালদের নেতা ছিলেন গীজারিক। ভ্যান্ডালরা ছিল হুণদের মতই দুর্ধর্ষ জাতি। গীজারিক আফ্রিকার রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করে সেখানে ভ্যান্ডাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একবার রোম আক্রমণ করেন। তিনি ছিলেন খঞ্জ। অসাধারণ বুদ্ধি সাহস, দৃঢ়তা ও নৃশংসতার দ্বারা তিনি এতবড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন যা খুব কম 'বর্বর' জাতিই করতে পেরেছিল। তিনি অ্যাটিলার মতই নৃশংস ছিলেন। অ্যাটিলার নেতৃত্বে হূণ এবং গীজারিকের নেতৃত্বে ভ্যান্ডালরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সন্ত্রাস ছড়িয়ে অঞ্চলের পর অঞ্চল জনশূন্য করে রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে সহজ করে তুলেছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে জার্মান বসতিঃ—বিদেশাগত জাতিগুলি রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে বসতি বিস্তার করে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। ফ্রাঙ্করা রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ও হল্যান্ড, ফ্ল্যান্ডার্স, কলোন প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আকুইটেইনকে কেন্দ্র করে তার চার পাশের অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে ভিজিগথরা। তারা ড্যানিয়ুব নদী অতিক্রম করেও কিছু অঞ্চল অধিকার করে। ভ্যান্ডালদের বসতি ছিল স্পেন এবং আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে। ভিজিগথরা ফ্র্যাঙ্কদের চাপে পীরেনিজ পাহাড় অতিক্রম করে উত্তর স্পেনে অগ্রসর হলে ভ্যান্ডলরা দক্ষিণ স্পেনে সরে যায়। অস্ট্রোগথদের বসতি ছিল টাসকানি এবং মধ্য ইটালী। র‍্যাভেনা, পেভিয়া, ভেরোনা প্রভৃতি শহরগুলিতে অস্ট্রোগথদের বসতি ছিল। কিন্তু এইসব শহরগুলি ছিল মূলত লম্বার্ডদের বাসস্থান। পেভিয়াকে মূল ঘাঁটি করে লম্বার্ডরা উত্তর ও দক্ষিণে ইটালীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

বৈদেশিক জাতিগুলির জীবনযাত্রা :—বিদেশ থেকে যে সব জার্মান জাতি রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিল তারা বেশির ভাগই এসেছিল উত্তর দিকের স্ক্যান্ডেনেভিয়া থেকে। তারা ছিল সনাতন টিউটন জাতির শাখা-প্রশাখা। ফর্সা রং, লালচে চুল, নীল চোখ, বিশাল দেহ নিয়ে তারা ছিল কিছুটা বন্য। তাদের শরীর ছিল কঠিন, স্বভাব ছিল নির্দয়, তাদের জীবন যাত্রার মধ্যে সভ্যতার ছোঁওয়া ছিল কম। এদের মধ্যে পশ্চিম দিকের জার্মানরা, ফ্র্যাঙ্ক, অ্যাংগলস্, স্যাক্সন প্রভৃতিরা কৃষিকার্য জানত এবং কিছুটা সভ্য ছিল। পরবর্তী কালে ফ্রান্স রাজ্য গড়ে উঠেছিল ফ্র্যাংকদের প্রভাবে, আর ইংল্যান্ড গড়ে উঠেছিল স্যাক্সনদের প্রভাবে।

জার্মানরা ছিল অনেকটা যাযাবর স্বভাবের। তাই বাড়ীঘর বানানোর কৌশল তারা জানত না। তারা চামড়ার জামা পরত, কখনও কখনও মাটির গর্ত করে থাকত, কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে খেত আর কাঠ জ্বালিয়ে শীত

নিবারণ করত। তারা ছিল যোদ্ধৃজাতি, তাই শিকার আর যুদ্ধ তারা ভালোবাসত। অথচ তারা ছিল অতিথি বৎসল, সরল ও নির্মল চরিত্রের এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনে পরিচ্ছন্ন। তারা ঘি, মাখন ও মাংস খেতে ভালোবাসত। 'বর্বর' হলেও জার্মানদের মধ্যে রমণীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ট্যাকিটাস নামে এক প্রাচীন ঐতিহাসিক জার্মানদের নৈতিকতাবোধের প্রশংসা করেছেন।



বর্বর আক্রমণের যুগে জার্মান যোদ্ধা

জার্মানরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল ও প্রকৃতির পূজা করত। তাদের বজ্রের দেবতার নাম 'থর' (যার থেকে ইংরাজী থারসডে কথাটি এসেছে), ইন্দ্রজালের দেবতার নাম 'ওডেন', আকাশ ও বিবাহের দেবীর নাম 'ফিগ্রা'। জার্মানদের রাজনৈতিক সংগঠনের বনিয়াদ ছিল গ্রাম। তাদের রাজ্যকে বলা হত 'রাইক'। এক একটি জাতির এক একটি রাজ্য ছিল। আইনের বোধ জার্মানদের ছিল না।

জার্মানরা রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে এসে রোমানদের সাথে মিশে যায়। কেউ কেউ রোমান সাজ পোষাক গ্রহণ করতে শুরু করে। কোন কোন জার্মান গোষ্ঠীর মধ্যে ল্যাটিন ভাষা শেখার আগ্রহ দেখা দেয়। তাদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং সেই ধর্মের সংস্পর্শে এসে মার্জিত হতে থাকে।

ঐতিহাসিকরা বলেন যে রোমান আইন ও খ্রীষ্টধর্ম, এই দুইয়ের সংস্পর্শে এসে জার্মানরা সভ্য হয়েছিল।

সংক্ষিপ্তসার—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ থেকে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে থাকে। 'বর্বর' নামে অভিহিত জার্মান জাতির দুটি ধারা হূণদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানা ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে। অবশেষে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের শেষ সম্রাট রমুলাস একজন বর্বর সৈন্যাধ্যক্ষ ওডোয়াচারের হাতে পরাজিত হন। বর্বরের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার সাথে সাথে রোমান সাম্রাজ্যের পতন সুনিশ্চিত হয়।

এই জার্মান জাতিরা ছিল সনাতন টিউটন জাতির শাখা প্রশাখা। তারা ছিল যাযাবর প্রকৃতির। তারা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস ও প্রকৃতির পূজা করত। ধীরে ধীরে তারা রোমানদের সাথে মিশে যায়। রোমান আইন ও খ্রীষ্টধর্ম তাদের খুবই প্রভাবিত করেছিল।

অনুশীলনী

১। বর্বর আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্যের পতন কি ভাবে হয়েছিল ?

২। বর্বর জাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের কোন্ কোন্ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল ? যে কোন দুজন বর্বর নেতা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। জার্মান জাতিগুলির জীবনযাত্রা কি রকম ছিল ?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। অ্যালারিক কে ছিলেন ?

২। হূণদের নেতা কে ছিলেন ?

৩। অস্ট্রোগথদের বসতি কোথায় ছিল ?

৪। জার্মানরা কাকে পূজা করত ?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১। খ্রীষ্টীয় —— শেষভাগ থেকে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে থাকে।

২। হূনরা ছিল —— জাতির একটি শাখা।

৩। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভ্যাণ্ডালদের নেতা ছিলেন ——।

৪। জার্মানদের রাজ্যকে বলা হত ——।

ইয়োরোপের অন্ধকার যুগ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

[অন্ধকারযুগ একটি ভ্রান্ত ধারণা। মঠ এবং গ্রন্থগার প্রভৃতি জ্ঞানচর্চার জীবন্ত নিদর্শন]

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যে সময়, তাকে একসময়ে ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ (Dark Age) বলা হত। আজকাল আর আমরা অন্ধকার যুগ বলিনা, কারণ কথাটা ঠিক নয়। কোন দেশে যদি জ্ঞানের চর্চা বন্ধ হয়; তবেই সভ্যতার আলো মুছে যায়, অন্ধকারের গাঢ় ছায়া নেমে আসে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে জ্ঞান চর্চা একবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল একথা ঠিক নয়। বর্বরদের আক্রমণে প্রাচীন সভ্যতার সব চিহ্নগুলি বিলীন হয়ে গিয়েছিল এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। বর্বর জাতিগুলি খ্রীষ্টান ধর্ম, খ্রীষ্টান গির্জা ইত্যাদির প্রতি বিভিন্ন সময়ে যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিল, ব্যাক্তিগত জীবনে তারা যে নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছিল এবং সর্বোপরি রোমান আইনকে গ্রহণ করার যে প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তা' থেকে বোঝা যায় তারা সভ্যতার আলোক মুছে ফেলার মত বর্বর ছিল না।

আসলে রোমের সাম্রাজ্য ছিল খুব বড়, আর অনেকদিন ধরে তা টিকে ছিল। তাই এই সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পরই পাঠকদের মনে হয় সব তলিয়ে গেছে। সাম্রাজ্য তলিয়ে গেলেও সমস্ত ইউরোপ মহাদেশ ব্যেপে তখনো জেগে ছিল অসংখ্য মঠ যাদের বলা হত মনাষ্টারিজ এই মঠগুলির মধ্যে ছিল বড় বড় গ্রন্থাগার, আর সেখানে ছিল অনেক বই। বই ও পুঁথিপত্রের এই বিপুল ভাণ্ডার নিয়ে মঠের সন্ন্যাসীরা জ্ঞানের চর্চাকে বন্ধ হতে দেননি। রোম, ওয়ারমাউথ, জ্যারো, ববিও ইত্যাদি স্থানের মঠগুলিতে বিপুল সংখ্যক বই ছিল। এই সব বই ও তাদের পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন জ্ঞান মঠের ভেতর সংরক্ষিত হত।

ইউরোপের মঠগুলি সাধারণতঃ লোকালয়ের বাইরে, পাহাড়ের নীচে, বনের কোল ঘেঁষে, নির্জন জায়গায় অবস্থিত ছিল। নির্জনতায় শিক্ষা-ব্যহত হত না। তা ছাড়া মঠে আসতেন তীর্থযাত্রী, পরিব্রাজক ও পর্যটনশীল মানুষেরা ও জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা। তারা এসে সন্ন্যাসীদের প্রভাবে পড়তেন এবং মঠের জ্ঞান চর্চার অংশীদার হতেন। তারা ফিরে যেতেন নূতন জ্ঞান

বিদ্যচর্চার আগ্রহ এবং পুঁথিপত্র নিয়ে। এই ভাবে মঠের ভেতরের জ্ঞান বাইরে ছড়িয়ে পড়ত।

মঠের সাথে সংলগ্ন হয়ে গড়ে উঠেছিল কিছু কিছু বিদ্যালয় এবং কোন কোন স্থানে জনবসতি। এই সব বিদ্যালয়ে ল্যাটিন ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ের চর্চা হত, তাছাড়া এই সময়ে মঠের ভেতরে পুঁথি লেখার বা পুঁথি নকল করার চল দেখা দিয়েছিল। বিখ্যাত সন্ন্যাসী সেণ্ট বেনেডিক্ট সন্ন্যাসীদের



মঠের একজন সন্ন্যাসী পুঁথি নকল করছেন

জীবন চর্চার যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ছিল যে মঠের সন্ন্যাসীদের প্রত্যেকদিন কয়েক ঘন্টা বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যাচর্চা করতে হবে। অনেক সন্ন্যাসী পুঁথি নকল করে এই দায়িত্ব পালন করতেন।

বিদ্যাচর্চা ছাড়াও মঠের সন্ন্যাসীরা মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দিতেন। ন্যায়-অন্যায় বোধ, সততা, তিতিক্ষা, ক্ষমা, করুণা এই সমস্ত গুণাবলী যাতে মানুষের মনে বিকশিত হয় তার দিকে সংন্যাসীরা নজর দিতেন। গ্রেগরী, কলম্বান, থিয়োডোর, বনিফেস প্রমুখ সন্ন্যাসীরা পবিত্র জীবনচর্চার নীতিকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফুলডা, রিশনু, সেণ্ট গল প্রভৃতি মঠের থেকে সভ্যতার আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীষ্টধর্ম সব সময়ে পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়, দান (charity), দয়া (clemency) ইত্যাদি ধারণাগুলির উপর জোর দিত। তাই খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে এসে বর্বর জাতিগুলিও সভ্য হয়ে ওঠে। ইয়োরোপে অন্ধকার যুগ অবতারণার কোন সুযোগই পায়নি।

সংক্ষিপ্তসার :— একসময়ে ইউরোপের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলে মনে করা হত। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। জ্ঞানের চর্চ্চাই হল সভ্যতার আলো। মধ্যযুগে জ্ঞানের চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। রোমান সাম্রাজ্য তলিয়ে গেলেও সমস্ত ইউরোরোপ মহাদেশ ব্যেপে ছিল অসংখ্য মঠ বা মনাস্টারিজ। এই মঠগুলির মধ্যে ছিল বড় গ্রন্থাগার। মঠের সন্ন্যাসীর বই পুঁথিপত্রের এই বিপুল ভান্ডার নিয়ে জ্ঞানের চর্চাকে বন্ধ হতে দেননি। জ্ঞানচর্চা ছাড়াও তাঁরা মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দিতেন। যে যুগে জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল, এবং পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, দান দয়া ইত্যাদি ধারণাগুলির উপর জোর দেওয়া হত তাই সে যুগকে কোনক্রমেই অন্ধকার যুগ বলা চলে না।

অনুশীলনী

১। ইয়োরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলতে কোন্ যুগকে বোঝানো হত?

২। মঠের সন্ন্যাসীরা কিভাবে মধ্যযুগের ইয়োরোপে সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন?

৩। মধ্যযুগের ইয়োরোপের কয়েকটি বড় মঠ ও গ্রন্থাগারের নাম লেখ। সভ্যতার শিখাকে এরা কি ভাবে জ্বালিয়ে রেখেছিল?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। মনাস্টারিজ কাকে বলা হত?

২। মনাস্টারিজে কি থাকত?

৩। সেণ্ট বেনেডিক্ট কে ছিলেন?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১। মঠে আসতেন তীর্থযাত্রী,—ও পর্যটনশীল মানুষেরা ও—ছাত্ররা।

২। মঠের সাথে সংলগ্ন হয়ে গড়ে উঠেছিল কিছু কিছু——এবং কোন স্থানে——।

৩। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাবে এসে——সভ্য হয়ে ওঠে।

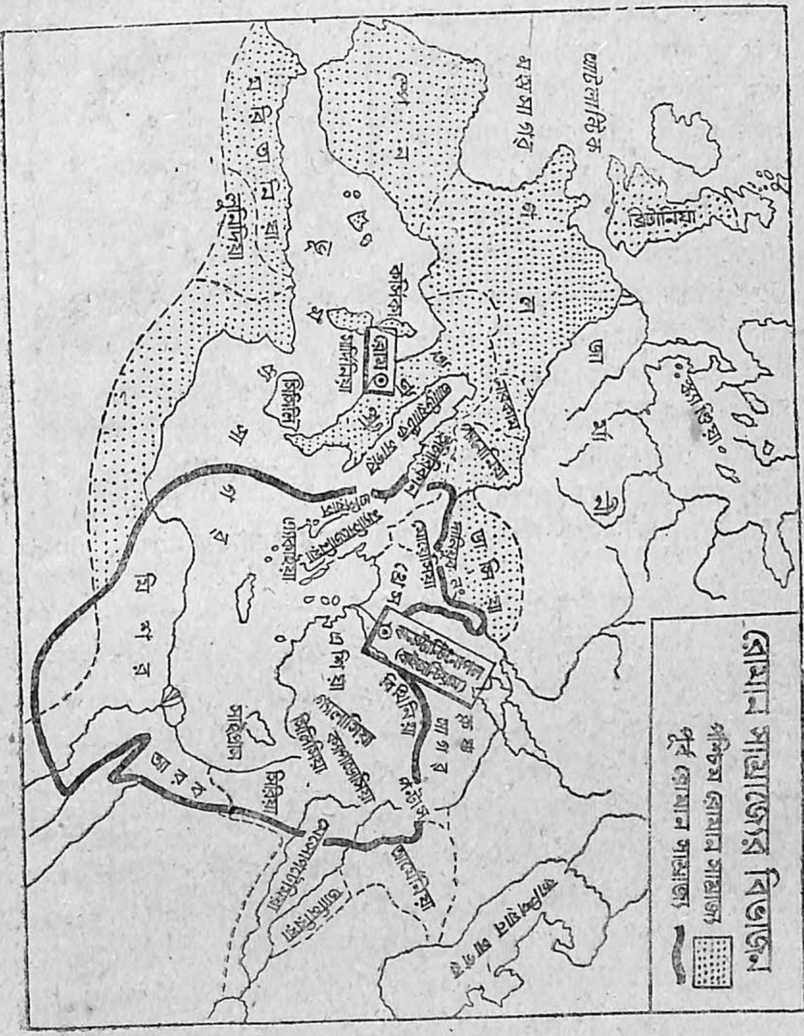
বাইজান্‌টাইন্‌ সাম্রাজ্য ও সভ্যতা

[কনষ্টান্‌টাইন্‌ ; সাম্রাজ্য জাষ্টিনিয়ান ; জাষ্টিনিয়ানের রাজ্য জয় ; জাষ্টিনিয়ানের সংস্কার ; জাষ্টিনিয়ানের আইন ; বাইজান্‌টাইন্‌ শিল্প ও বাণিজ্য ; বাইজান্‌টাইন্‌ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ; বাইজান্‌টাইন্‌ সভ্যতার অবনতি]

ইয়োরোপে পশ্চিমভাগে রোমান সাম্রাজ্যের যে অংশ জার্মান ও হূণদের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি তার রাজধানী ছিল রোম। পূর্বভাগের রাজধানী ছিল বাইজান্‌টিয়াম যার থেকে পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের নাম বাইজান্‌টাইন্‌ সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। গ্রীস, বলকান অঞ্চল, এশিয়া মাইনর, আরমেনিয়া, সিরিয়া ও মিশর নিয়ে গঠিত ছিল বাইজান্‌টাইন্‌ সাম্রাজ্য। ইতিহাসে একে কখনও বলা হয় পূর্ব রোম সাম্রাজ্য। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গঠিত ছিল এই সাম্রাজ্য। এক সম্রাটের শাসন ছাড়া অন্য কোন ঐক্য ছিল না। কিন্তু রাজধানী কনস্টান্টিনোপল ছিল দুর্ভেদ্য শহর, ধন সম্পদ ছিল প্রচুর এবং শাসন ব্যবস্থা ছিল কঠোর। জার্মান আক্রমণের ফলে পশ্চিম ইউরোপে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল তখন একমাত্র পূর্ব সাম্রাজ্যের সভ্যতা অটুট শৃঙ্খলায় টিকে ছিল।

কনষ্টান্‌টাইন্‌ ঃ—৬৫৭খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক বণিকরা বাইজানটিয়াম শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। শহরটি ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝে বসফরাস প্রণালীর ধারে। শহরটি অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য অনুন্নত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমদিকে রোমের সম্রাট কনস্টান্‌টাইন্‌ সেখানে তাঁর রাজধানী নিয়ে যান। তাঁর নাম অনুসারেই বাইজানটিয়ামের নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে অবস্থিত থাকতে এই শহর থেকে সিরিয়া, আরমেনিয়া প্রভৃতি সীমান্তে নজর রাখা সম্ভব ছিল। এ ছাড়া রোমে গণতান্ত্রিক প্রভাব বেড়ে যাওয়াতে সম্রাট চেয়েছিলেন তাঁর একছত্র ক্ষমতাকে ধরে রাখতে। রোম ছেড়ে বাইজানটিয়ামকেই তাই তিনি রাজধানী হিসাবে বেছে নিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ এবং খ্রীষ্টধর্মকে সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই কনস্টান্‌টাইনের প্রধান কীর্তি। তাঁর নতুন রাজধানী গড়ে উঠল এই নতুন ধর্মকে আশ্রয় করে। আর এই ধর্ম পেগান বা

আদিম ধর্মের রূক্ষতা কাটিয়ে সমস্ত বর্বর জাতির মধ্যে সভ্যতার কোমল প্রভাব এনে দিয়েছিল। নগর প্রতিষ্ঠাতা রূপে কনস্টান্‌টাইন্‌ ইতিহাসে বিখ্যাত হলেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন বর্বর সমাজে খ্রীষ্ট ধর্মের সংস্থাপক ও প্রচারক রূপে।



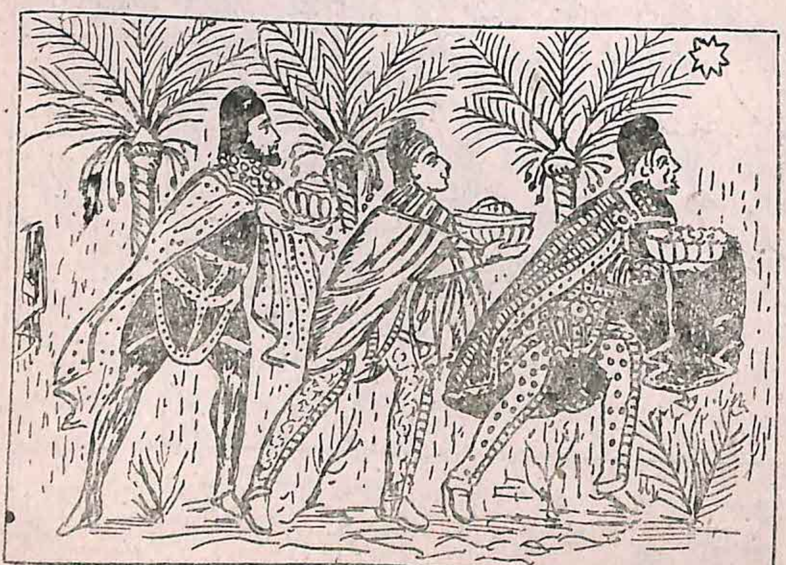
সম্রাট জাস্টিনিয়ান :—(৫১৪-৫৬৫ খ্রীঃ)—জাস্টিনিয়ানের পূর্ব নাম ছিল উপ্রাভিডা। ঐ পূর্ব রোমক সম্রাট জাস্টিন তাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা দেন। পরে তাঁকে তিনি শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন।

৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টিনের মৃত্যুর পর জাস্টিনিয়ান সম্রাট হন। তাঁর চরিত্র ও কর্মনিষ্ঠা তাঁকে রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটের সম্মান দিয়েছে। অসামান্য ছিল তাঁর বুদ্ধি, অসীম ছিল তাঁর কর্মক্ষমতা অবসর-হীনভাবে কাজ করতেন বলে লোকে তাকে দানব মনে করত। তাঁর মহিষী এবং সহকর্মিণী থিয়োডোরা ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী। বেলিসারিয়াস নামে একজন প্রতিভাবান সেনাপতি ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক।



সম্রাট জাষ্টিনিয়ান

জাস্টিনিয়ানের রাজ্যজয় :— জাস্টিনিয়ানের রাজ্য জয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল রোমক সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক শক্তিশালী সেনা ও নৌ-বাহিনী গঠন করেন। বীর সেনাপতি বেলিসারিয়াস সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জাস্টিনিয়ানের প্রথম যুদ্ধ হয় সাসানী বংশের অধীনে শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে। চীন ও



সম্রাট জাস্টিনিয়ানের কাছে বন্দীদের উপহার

ভারতের বাণিজ্যপথগুলির অধিকার নিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রায়ই বিরোধ লেগে থাকত। এই যুদ্ধে রোমান সম্রাট কোন সুবিধা করতে পারেননি। তাঁর দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। তিনি চেয়েছিলেন বর্বরদের হাত থেকে রোমান সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে অধিকার করে আবার এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে।

এই উদ্দেশ্যে জাস্টিনিয়ান সেনাপতি বেলিসারিয়াসকে উত্তর আফ্রিকায় পাঠান। সেখান থেকে সেনাপতি বেলিসারিয়াস ভ্যানডালদের বিতাড়িত করে কার্থেজ অধিকার করেন। অস্ট্রোগথদের শক্তি ধ্বংস করে তিনি ইটালী জয় করেন। জাস্টিনিয়ানের রাজত্ব কালে স্পেনে ভিজিগথদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠানো হয়। কিন্তু এক সামান্য অংশ ছাড়া স্পেন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শেষ জীবনে এই বীর সেনাপতি সম্রাটের বিরাগ ভাজন হন। তাঁকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করা হয়। সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। মৃত্যুর (৫৬৩ খ্রীঃ) মাত্র দু বছর আগে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁর সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয়।

জাস্টিনিয়ানের সংস্কার :—জাস্টিনিয়ান ছিলেন জ্ঞানী ব্যাক্তি। রাষ্ট্র-নীতি স্থাপত্য ও শিল্পে ছিল তাঁর অসীম স্পৃহা। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দিকে তিনি তৈরী করেছিলেন সুদৃঢ় দুর্গ, গির্জা, মঠ, হাসপাতাল এবং জলাশয়। কনস্টান্টিনোপলের সেন্ট সোফিয়া গির্জা তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। গির্জাটি ছিল বাইজানটাইন শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই গির্জার মধ্যে ছিল নানাবিধ মোজেইক ছবি, স্বর্ণ, রৌপ্য ও গজদন্তের কারুকার্য, নানা রঙের মার্বেল পাথর, কাঁচ, মণি, মুক্তার অলঙ্করণ। মোজেইক বলতে বোঝাত ছোট ছোট রঙিন কাঁচ ও পাথর দিয়ে গির্জা ও প্রাসাদের দেওয়ালে, ছাদে, মেঝেতে নানা বর্ণের চিত্রকলা। সোফিয়ার গির্জা ছিল এই রকম চিত্র-কলা মণ্ডিত। গির্জাটির প্রধান বিশেষত্ব হল তার গম্বুজ। চতুষ্কোণ দেও-য়ালের উপর তা এমনভাবে বসানো ছিল যে দেখে মনে হত যেন শূন্যে ঝুলছে। দশ হাজার লোক ছয় বছর ধরে এই গির্জাটি নির্মাণ করেছিল।

জাস্টিনিয়ান অনেক পথ ও সেতু নির্মাণ করেছিলেন। উন্নত কৃষির ব্যবস্থা ও বাণিজ্যর দিকেও তিনি নজর দিয়েছিলেন। তাঁর সময় দুইজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক চীনদেশ থেকে গুটিপোকা আনেন এবং রেশম তৈরীর ব্যবস্থা করেন।

জাস্টিনিয়ানের আইন: জাস্টিনিয়ানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল রোমের আইন প্রণয়ন। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার সাথে সাথে রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত

ছিল বিভিন্ন প্রকার রীতি-নীতি ও আইন। এরই সাথে রোমের আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত মিশে আরো জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। তিনি আইনকে সরল ও সুসংবদ্ধ করেন। এই বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি জাস্টিনিয়ানের আইন (Code Justinian) নামে খ্যাত। জাস্টিনিয়ান তিনটি প্রধান গ্রন্থ প্রকাশ করে আইনকে সমস্ত জটিলতার হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। প্রথম গ্রন্থটি হল কোড (Code)। এটি হল সাম্রাজ্যের সংবিধান। পুরাতন, জটিল ও অস্পষ্ট আইনগুলিকে মুছে ফেলে ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় নূতন আইন রচনা করে তাকে গ্রথিত করা হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল ডাইজেস্ট (Digest)। প্রাচীন আইনবিদদের সিদ্ধান্তগুলিকে এর মধ্যে সংকলিত করা হয়। তৃতীয় গ্রন্থটি হল ইন্‌স্টিটুট্‌স্ (Institutes)। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য রোমান আইনের ভাষ্যকে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। জাস্টিনিয়ানের এই আইন গ্রন্থগুলি পরবর্তী ইউরোপের যাবতীয় আইনের বুনিয়াদ রচনা করেছিল। আজও ইউরোপে যে আইন চালু রয়েছে তা সনাতন রোমান আইনের উপরই গড়ে উঠেছে।

রাজধানী কনস্টান্টিনোপল :—কনস্টান্টিনোপল ছিল এক দুর্ভেদ্য শহর। শত্রুরা একে বারবার আক্রমণ করেও কোন সুবিধা করতে পারেনি। শহরের আকর্ষণ ছিল তিনটি—সেন্ট সোফিয়া গির্জা, সম্রাটের প্রাসাদ ও হিপোড্রোম নামে জনসাধারণের এক বিশাল প্রমোদাগার। এর জন সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। অলস ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এদের জীবন।

বাইজান্‌টাইন্ সম্রাটদের জীবনযাত্রা : বাইজান্‌টাইন্ সম্রাটরা খুব বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। তাদের প্রাসাদের আড়ম্বর প্রায় কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্রাটের জমকালো পোষাক, প্রাসাদের দেওয়ালে ও মেঝেতে মোজেইকের রঙীন কাজ, এখানে-ওখানে মণিমুক্তার ফুল, সোনার পাখী—সব কিছুই ছিল সাধারণ মানুষের কাছে বিস্ময়। প্রাসাদের সোনার সিংহগুলি এমনভাবে তৈরী ছিল যে তারা গর্জন করতে পারত, সোনার পাখীরা গান গাইত। দেশ-বিদেশের কত রাজদূত বাইজান্‌টাইন্ সম্রাটদের সভায় আসতেন। তাঁরা এইসব আজব জিনিস দেখে অবাক হতেন। বাইজান্‌টাইন্ সম্রাটদের ঐশ্বর্য যেমন ছিল তেমন ক্ষমতাও ছিল। রাজকার্যের জন্য অসংখ্য রাজ কর্মচারী ছিল, দেশরক্ষার জন্য ছিল বহু সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ। জলযুদ্ধে বাইজান্‌টাইন্ সৈন্যরা খুব পারদর্শী ছিল। দেশ সুরক্ষিত ছিল বলে দেশের মানুষ শিল্পকার্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল। এ বিষয়ে সম্রাটরা তাদের অনেক উৎসাহ দিতেন। সমস্ত বিষয়ে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বলে জনসাধারণ তাঁদের দেবতার মতন সম্মান করত।

বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যে ধর্মজীবন : বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল গ্রীক ধর্ম সমাজভুক্ত। তাই তাদের বলা হত 'গ্রীক খ্রীষ্টান'। তারা ছিল ইটালী ও পশ্চিম ইউরোপের ক্যাথলিক ধর্মসমাজ থেকে ভিন্ন। ক্যাথলিকরা রোমের বিশপ পোপকে তাদের ধর্মগুরু বলে মনে করতেন। তাদের বলা হত 'ল্যাটিন খ্রীষ্টান'। 'গ্রীক খ্রীষ্টান'রা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করতেন না। তাদের স্বতন্ত্র ধর্মগুরু ছিলেন। তিনি বাস করতেন কনস্টান্টিনোপলে। বাইজান্টাইন্ সম্রাট পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন বলে বহু গির্জা থেকে মূর্তি ও ছবি ধ্বংস করার আদেশ দেন। পোপ এই নীতির বিরোধিতা করেছিলেন বলে বাইজান্টাইন্ সম্রাটদের সাথে তাঁর বিরোধ ঘটে এবং খ্রীষ্ট জগৎ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

বাইজান্টাইন্ শিল্প ও বাণিজ্য : মধ্যযুগে বাইজান্টাইন্ ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। বহুদেশের সঙ্গে এই বাণিজ্যকেন্দ্রের ছিল আদান-প্রদান। মধ্য এশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষের সাথেই ছিল মূল বাণিজ্য সম্পর্ক। নৌবহরের সাহায্যে বাণিজ্যের প্রসার দূরদূরান্তে ঘটেছিল। দক্ষিণে মিশর, ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া), পূর্বে সিংহল ও ভারতবর্ষ, উত্তরে রাশিয়া ও চীন পর্যন্ত বাইজান্টাইনের জাহাজ যাতায়াত করত। বয়নশিল্পে বাইজান্টাইনের খ্যাতি ছিল। রেশম শিল্পের শুরু হয়েছিল জাস্টিনিয়ানের আমলে। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জিনিস আসত। আবিসিনিয়া ও মিশর থেকে আসত হাতীর দাঁতের জিনিস, নানারকম সুগন্ধি মশলা, ঔষধ, শস্য, সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং মূল্যবান পাথর। জাহাজ নির্মাণের কাঠ আসত সিংহল ও ভারতবর্ষ থেকে। রাশিয়া থেকে আসত মধু মোম, লোম, পশম এবং ক্রীতদাস। সূচিশিল্প, কারুশিল্প, কাঁচশিল্প এবং মিনার কাজেও বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। কাঁচের উপর বাইজান্টাইন্ শিল্পীরা বিচিত্রবর্ণের যে কাজ করত তাকে বলা হয় মোজেইক। কাঠের উপর নরুণ এবং বাটালি দিয়ে যে কাজ তারা করত তা হত খুব সূক্ষ। কাঠের উপর নানারকম জীবজন্তুর মূর্তি তারা খোদাই করত। এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য ইটালী, ফ্রান্স ও পূর্ব ইয়োরোপে রপ্তানী করা হত।

বাইজান্টাইন্ সভ্যতা ও সংস্কৃতি : বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য এশিয়া ও ইয়োরোপের মিলনস্থলে অবস্থিত বলেই উভয় মহাদেশের সংস্কৃতিই সে গ্রহণ করতে পেরেছিল। গ্রীক সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা চলত সেখানে। রোমান আইন, গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বহু ব্যক্তির সেখানে সমাগম হত। জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলি কনস্টাণ্টিনোপল, অ্যান্টিয়ক, এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়াতে অবস্থিত ছিল।

বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যের মানুষদের ছিল অর্থ আর ছিল অবসর। তাই একদিকে ছিল আমোদ-প্রমোদের প্রাচুর্য; ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্যান বিলাস এবং মূল্যবান সাজপোষাক আর অন্যদিকে শিল্পকলায় দেখা দিয়েছিল জাঁকজমক আড়ম্বর; রঙের জৌলুষ ও অলঙ্কারের প্রাধান্য। বাইজান্টাইনের শিল্প বিশ্বকে করেছিল অভিভূত। কনস্টান্টিনোপলের রাজপ্রসাদ, গির্জা, মনোরম অট্টালিকা, স্নানাগার ও বিজয়স্তম্ভ তখন প্রায় প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

রাজপ্রাসাদে ছিল সোনার গাছ। তাতে ছিল মণিমুক্তার ফুল ও ফল। তাতে বসানো ছিল 'সোনার পাখি'। কর্মচারীরা জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরত। বলিষ্ঠদেহী এবং গৌরবর্ণ সৈন্য আসত এশিয়া মাইনর এবং আর্মেনিয়া থেকে। এত আড়ম্বপূর্ণ রাজপ্রাসাদ তখনকার দিনে আর কোথাও ছিল না।

বাইজান্টাইন্ সভ্যতার অবনতি ঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য একহাজার বছর ধরে টিকেছিল। অনেকগুলি কারণে তার পতনের পথ প্রশস্ত হয়ে আসছিল। জাস্টিনিয়ানের পরবর্তী সম্রাটগণ ছিলেন অকর্মণ্য। তাঁদের আমলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সৈন্যরা বিদ্রোহ করতে থাকে। জনগণ অশান্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সিরিয়া; মিশর প্রভৃতি প্রদেশগুলি ধর্ম বিষয়ে মতান্তর হওয়ার জন্য সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে ধর্মগুরু পোপের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে সম্রাটদের বিবাদ হওয়ার ফলে খ্রীষ্টান জগৎ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে থাকে বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যের গ্রীক ধর্ম সমাজ আর আর অন্যদিকে ইটালী ও পশ্চিম ইয়োরোপে ক্যাথলিক ধর্মসমাজ। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধও সম্রাজ্যকে অনেকটা দুর্বল করে দেয়। তার সাথে যুক্ত হয়েছিল সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ। সাম্রাজ্যকে একেবারে পতনের মুখে নিয়ে এসেছিল আরব ও সেলজুক তুর্কীদের আক্রমণ। ১৪৫৩ সালে অটোমান তুর্কীদের আক্রমণে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটলে সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকু লুপ্ত হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্তসার ঃ—পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নাম ছিল বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য। রাজধানী ছিল কন্স্টান্টিনোপাল। সম্রাট কন্স্টান্টাইন্ ছিলেন এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। এই সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ান। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল রোমের আইন প্রণয়ন যা জাস্টিনিয়ানের আইন নামে বিখ্যাত।

মধ্যযুগে বাইজান্টাইন্ ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই সাম্রাজ্যের খ্যাতি ছিল প্রচুর। ১৪৫৩ সালে এই সাম্রাজ্যের পতন হয়।

অনুশীলনী

১। কনস্টান্‌টাইন কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

২। জাস্টিনিয়ান কে ছিলেন? তাঁর রাজ্যজয় বর্ণনা কর।

৩। জাস্টিনিয়ানের সংস্কার বলিতে কি বুঝায়?

৪। বাইজান্‌টাইন্‌ সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বর্ণনা দাও।

৫। বাইজান্‌টাইন্‌ সাম্রাজ্যের পতন হল কিভাবে?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। কনস্টান্টিনোপল কার নাম অনুসারে হয়?

২। উপ্রাভিডা কে ছিলেন?

৩। জাস্টিনিয়ানের মহিষীর নাম কি ছিল?

৪। 'জাস্টিনিয়ানের আইন' কি?

৫। হিপ্পোড্রাম কি?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১। ——নামে একজন প্রতিভাবান সেনাপতি ছিলেন জাস্টিনিয়ানের প্রধান সহায়ক।

২। জাস্টিনিয়ানের রাজ্যজয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল————হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা ——।

৩। কাঁচের উপর বাইজান্‌টাইন্‌ শিল্পীরা বিচিত্রবর্ণের যে কাজ করত তাকে বলা হয় —।

৪। —সালে অটোমান তুর্কীদের আক্রমণে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে।

৫। তাঁর সময়ে——খ্রীষ্টান ধর্মযাজক চীনদেশ থেকে——আনেন।

৬। কনস্টান্টিনোপলের——তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

৭। গ্রীক খ্রীষ্টানরা — প্রাধান্য স্বীকার করতেন না।

৮। এই বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি — নামে খ্যাত।

ইসলাম সভ্যতা ও তার প্রভাব

[আরব দেশ এবং আরববাসী ; সমাজও ধর্ম ; ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ ; ইসলাম ধর্মের প্রচার ; সমাজ সংস্কার, ইসলামের উপদেশ ; ইসলামের সাফল্যের কারণ ; পবিত্র খলিফার যুগ ; ওম্মায়া বংশ ; মহরম ; ওম্মিয়া বংশের সাম্রাজ্য বিস্তার ; আব্বাসীয় বংশ ; বাগদাদ ; স্পেনে মুসলমান সাম্রাজ্য; কর্ডোভা ; ইসলাম এবং ইউরোপের প্রতিক্রিয়া ; বিশ্ব শিল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আরবদের দান ; মধ্যযুগের আরব মনীষী]

আরব দেশ মরুভূমির দেশ। শুষ্ক, রুক্ষ, তপ্ত বালুকাময় দেশ এই আরব। এইখানে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে এক নূতন ধর্মের জন্ম হয়েছিল। সে ধর্মের নাম ইসলাম এবং তার প্রবর্তক হজরত মহম্মদ। ইসলামের আবির্ভাব পরে বলে এই ধর্ম পূর্ববর্তী ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

আরব দেশ ও আরববাসী : শুষ্ক মরুভূমির দেশে কঠিনভাবে জীবন নির্বাহ করতে হয়। তাই আরববাসী স্বভাবতঃই ছিল বলিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর। উত্তর ও দক্ষিণভাগে যেখানে কিছুটা উর্বর জমি রয়েছে, সেখানেই গড়ে উঠেছে বসতি। কৃষিকাজ করা ছিল কঠিন। ওয়েসিস অথবা উর্বর মরূদ্যানে কিছু কিছু কৃষিজাত হত। কৃষির অভাবে মেষ ও উট পালনই ছিল আরবদের প্রধান জীবিকা। আরববাসীরা ছিলো দুটো ভাগে বিভক্ত। একদল স্থায়ী ভাবে বসবাস করত। আরেকদল যাযাবর বা বেদুইন। খাদ্যবস্তুর অভাব হলেই এই যাযাবরেরা চলে যেত অন্যস্থানে। সংগে নিত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, উট এবং মেষ। চাষের জমি অভাব ছিল। তাই তারা ব্যবসা করতে ভালবাসত। সুযোগ পেলেই তারা লুঠতরাজ করত। খাদ্যাভাবের জন্যই আরবজাতি ছিল পর্যটনশীল ও বাণিজ্যে আসক্ত।

সমাজ ও ধর্ম : আরব সমাজ ছিল গোষ্ঠীভিত্তিক। কতকগুলি পরিবার নিয়ে তৈরী হত একটি গোষ্ঠী। আবার কতক গুলো গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠত একটি বিরাট উপজাতি। উপজাতির প্রধানকে বলা হত 'শেখ'। এই সব বিভিন্ন দলের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ লেগে থাকত। যুদ্ধপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আরবগণ ছিল অতিথি বৎসল। সংগীত ও কবিতা রচনায় তারা ছিল দক্ষ। গান ও কবিতা প্রত্যেক উৎসবেরই একটি অংগ ছিল। শুক্রবারে তারা বাজারে সমবেত হত, সেখানে বেচাকেনা, নাচগান, কবিতা আবৃত্তি হত।

আরবদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। তাহা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করত। 'কাবা' নামে প্রাচীন মন্দিরে নানা স্থান থেকে পাথর সংগ্রহ করা ছিল। একটি বড় কালো পাথর ছিল দেবতার প্রতীক। প্রত্যেক আরব পরিবারেই বাস্তুদেবতা থাকত। কোন যুদ্ধ বা লুন্ঠনের আগে তারা এই বাস্তুদেবতার পূজা করত এবং জয়লাভকে দেবতার অনুগ্রহ বলে মনে করত। আরবজাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তীর্থযাত্রা। মক্কাই ছিল আরবদের প্রধান তীর্থস্থান।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ :—সম্ভবত ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় এক দরিদ্র পরিবারে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লা ও মাতার নাম আমিনা। তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। খুল্লতাত আবু তালিবের পরিবারে তিনি আশ্রয় লাভ করেন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। খুল্লতাতের গৃহে তিনি মেষ ও উট পালন করতেন। বড় হয়ে তিনি খাদিজা নামে এক বিধবার অধীনে চাকুরী নেন। তিনি ছিলেন কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। তাঁর পরিচালনায় খাদিজার অনেক লাভ হয়। খাদিজা মহম্মদকে বিবাহ করেন। মহম্মদের তখন পঁচিশ বছর, খাদিজার চল্লিশ। খাদিজাই হলেন মহম্মদের কন্যা ফাতিমার জননী। আবু তালিবের পুত্র আলির সঙ্গে ফতিমার বিবাহ হয়েছিল।

চল্লিশ বছর বয়সে মহম্মদের জীবনে এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। তিনি ধর্মের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে একদিন ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান : "আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই। মহম্মদ আল্লাহ্ প্রেরিত পুরুষ।" ঈশ্বরের এই বাণী মহম্মদ প্রচার করলেন। তাঁর ধর্মের নাম হল ইসলাম।

ইসলাম ধর্মের প্রচার :—প্রথম থেকেই মহম্মদ পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। আরবদের মধ্যে প্রচলিত বহু দেবদেবীর উপাসনার তিনি তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। প্রথমে তাঁর ধর্ম তাঁর পরিবারের কয়েকজন এবং অনুগত ক্রীতদাসেরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ এই নূতন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। মক্কার পৌত্তলিক মানুষেরা এতে শঙ্কিত হতে লাগল। ইতিমধ্যে মক্কার প্রতিদ্বন্দ্বী শহর এবং মহম্মদের মাতা আমিনার জন্মস্থান মদিনা ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে স্বীকৃত হল। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মক্কা থেকে পালিয়ে গিয়ে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এই ঘটনাকে মুসলমানগণ হিজিরা বলে থাকে। এই সময় থেকেই মুসলমান হিজিরা সংবৎ শুরু হয়েছে।

মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে মদিনাবাসী মহম্মদের 'আনসার' বা 'সহায়ক' হলেন। মদিনায় মহম্মদ তাঁর অবাধ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর

বেদুইন বাহিনী মক্কার অধিবাসীদের পূর্ব আচরণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের বাণিজ্য সম্ভার লুন্ঠন করতে লাগল। তার ফলে মক্কা ও মদিনার যুদ্ধ বেধে গেল। হিজিরার দুই বছর পরে মদিনার ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে একহাজার মক্কাবাসীর সঙ্গে তিনশ মদিনাবাসী মুসলমানের যুদ্ধ হল। যুদ্ধে মক্কাবাসী হেরে গিয়ে মহম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। হজরত মহম্মদ তাদের ক্ষমা করে তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিলেন। এরপর মহম্মদ মক্কায় তাঁর ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধীরে ধীরে সমস্ত আরবদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়।

প্রাচীন প্রথানুযায়ী মক্কাকেই হজরত মহম্মদ শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বলে গ্রহণ করেন। মুসলমানদের তিনি মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেন। পৌত্তলিকতার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী কিন্তু তিনি কাবার মন্দির ও ভেতরের কৃষ্ণবর্ণ শিলাখন্ডকে ইসলাম ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং পবিত্র বলে ঘোষণা করেন।

সমাজ সংস্কার ঃ—ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ কিছু সামাজিক সংস্কারও করেন। তিনি সুরাপান ও সুদগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন এবং পূর্ব-প্রচলিত বহুবিবাহপ্রথা নিয়ন্ত্রণ করেন। ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ না করলেও তিনি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। দরিদ্রের জন্য তিনি 'জাকাৎ' বা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। অ-মুসলমান প্রজাদের নিকট থেকে তিনি জিজিয়া কর নিতে শুরু করেন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মক্কায় তীর্থ যাত্রা করেন। এই তাঁর শেষ মক্কা যাত্রা। মক্কা থেকে ফিরে আসার তিন মাসের মধ্যেই মদিনা নগরে তাঁর মৃত্যু হয়। মুসলমানদের মতে তিনি ছিলেস পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল—অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষ।

ইসলামের উপদেশ ঃ—ইসলাম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। আল্লাহ্ এক; তাঁর বাণী কোরান এবং তাঁর প্রেরিত দূত মহম্মদ। মহম্মদের একেশ্বরবাদ বিশ্বাস সম্ভবত: ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব থেকেই এসেছিল।

ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণে রয়েছে ধর্মনীতি ও উপাসনা পদ্ধতি। তাছাড়া নৈতিক চরিত্র, সামাজিক ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা, বিচার পদ্ধতি ইত্যাদি সকল বিষয়েই নির্দেশ দেওয়া আছে। এতে রয়েছে মুসলমানদের কয়েকটি অবশ্য পালনীয় নিয়ম। প্রভাতে ধর্মের ডাক (আজান) দিতে হবে। দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করতে হবে। শুক্রবারে সমবেত নামাজ করতে হবে, রমজান মাসে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করতে হবে। নমাজের সময় মক্কার দিকে দৃষ্টিপাত এবং মক্কায় তীর্থযাত্রা বা হজও এই অবশ্যপালনীয় নিয়মের মধ্যে রয়েছে। পবিত্র ইসলাম ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করাই হচ্ছে প্রত্যেক

মুসলমানদের কর্তব্য। এর নাম জেহাদ। প্রত্যেক মুসলমানই ইসলামের প্রচারক এবং প্রত্যেক মুসলমানই একে অপরের ভাই।

ইসলামের সাফল্যের কারণঃ—মহম্মদের জীবিতাবস্থায় আরবদেশে মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ ছয় হাজারের বেশী ছিল না। কিন্তু একশ বছরের মধ্যেই আরবগণ ইসলামের নামে পশ্চিমে স্পেন, পূর্বে সিন্ধু উত্তরে মধ্য-এশিয়া দক্ষিণে সুদানের প্রান্ত পর্যন্ত জয় করল। এই সাফল্যের পিছনে প্রধান কারণ ছিল দুটো। এক, ইসলাম আরবদের দিয়েছিল এক-ঐক্যের আদর্শ। এক আল্লাহ, এক রসুল, এক পবিত্র কোরাণ এই তিনের ঐক্য তাদের জীবনের প্রেরণা। এছাড়া ইসলাম তাদের এক ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ



করেছিল। দুই, ইসলাম ধর্ম প্রচার ছিল তাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এই দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা অসি হাতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে নেমেছিল। তারা ছিল যোদ্ধা জাতি। বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আরবরা সেখানে ইসলামধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

পবিত্র খলিফার যুগঃ—মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্ম, আরব সাম্রাজ্য ও সমাজকে পরিচালিত করার জন্য সৃষ্টি হয় খলিফা পদ। খলিফা হলেন মর্তে মহম্মদের প্রতিনিধি।

মহম্মদের চারজন প্রধান শিষ্য—আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলি পরপর খলিফা হন। এঁদের বলা হয় পবিত্র খলিফা। আবুবকর ছিলেন

ধর্মভীরু মানুষ। তিনি সাধারণ দরিদ্রের মত জীবন যাপন করতেন। তিনি মনে করতেন প্রজাদের সেবা করাই তাঁর ধর্ম। আবুবকরের পরবর্তী খলিফা ওমর প্রথমে মহম্মদের শত্রু ছিলেন। কিন্তু কোরাণ আবৃত্তি শুনে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মহম্মদের শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে আরব সাম্রাজ্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ওমরকে একজন পারস্যদেশীও ক্রীতদাস মসজিদের মধ্যে হত্যা করে। পরবর্তী খলিফা ওসমান কোরাণের বাণীগুলি একত্র করে প্রচার করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে একটি দল গড়ে ওঠে এবং তাকে কোরাণ পাঠরত অবস্থায় হত্যা করা হয়। ওসমানের পরে খলিফা হন আলি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধেও একটি দল গড়ে ওঠে। তিনিও আততায়ীর হাতে নিহত হন।

ওম্মায়া বংশ :—আলির পর ওম্মায়াবংশীয় মোয়াবিয়া খলিফা পদ লাভ করেন। তিনি ছিলেন সিরিয়ার আরব সেনাপতি ও শাসনকর্তা। তাঁর সময় থেকেই খলিফা নির্বাচনে পূর্বপ্রচলিত গণতান্ত্রিক প্রথা উঠে যায়। এবং একটি রাজবংশ স্থাপিত হয়(৬৬১-৭৫০খ্রীঃ)। এই বংশের নাম ওম্মায়া বংশ। এই মোয়াবিয়া মদিনা থেকে সিরায়ার দামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

মহরম :—মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এজিদ খলিফা হন। কিন্তু আলির দ্বিতীয় পুত্র হুসেন খলিফা পদ দাবি করেন। ইরাক প্রদেশের রাজধানী কুফার দিকে হুসেন তাঁর অনুচর নিয়ে এগিয়ে যান। এজিদের সেনাপতি চার হাজার সৈন্যসামন্ত নিয়ে কুফার পঁচিশ মাইল দূরে কারবালার প্রান্তর অবরোধ করেন। বিশাল মরুভূমিতে জল এবং খাবার না পেয়ে শিশুও নারীসহ সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হল। তবুও এজিদের দয়া হল না। তিনি অবরোধ তুললেন না। হুসেনের ছিন্নমুণ্ড দামাস্কাসে এজিদের কাছে পাঠান হল। এই শোচনীয় ঘটনাকে 'শিয়া' মুসলমানগণ মহরম বা শোকদিবস রূপে পালন করে। কারবালা তাদের কাছে এক তীর্থস্থান।

ওম্মিয়া বংশের সাম্রাজ্য বিস্তার :—মোয়াবিয়ার পর উল্লেখযোগ্য খলিফা হলেন এজিদ, আবদুল মালিক এবং ওয়ালিদ। ওয়ালিদ পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেনে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এছাড়া মধ্য-এশিয়ার খোরাসান, অক্ষু (অক্সাস) নদীর তীর ও পাঞ্জাবের কিছু অংশে ইসলাম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। ওম্ময়া বংশের আমলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাদের চলেছিল অনবরত যুদ্ধ।

আব্বাসীয় বংশ (৭৫০-১২৫৮ খ্রীঃ) :—মোট ৫০৮ বছর রাজত্ব

করেছিলেন এই বংশের খলিফাগণ। তাঁরা মহম্মদের খুল্লতাতের বংশধর। এই বংশের সাঁইত্রিশ জন খলিফার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন হারুণ-অল রশিদ। এই হারুণ-অল-রশিদ এক কিংবদন্তী পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। আরব্য উপন্যাসের অনেক গল্পের তিনি প্রধান চরিত্র। তিনি খুব বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর ন্যায়বিচার এবং সুশাসন সর্বজনবিদিত ছিল। গল্পে আছে, তিনি প্রজাদের অবস্থা জানবার জন্য গভীর রাত্রে রাজধানীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর রাজধানী ছিল বাগদাদ। পশ্চিম ইউরোপের প্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লমানের সঙ্গে তাঁর ছিল বিশেষ সম্পর্ক।

বাগদাদ ঃ—রাজধানী বাগদাদ ছিল টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে। শহরের মাঝখানে খলিফাদের বিরাট প্রসাদ ছিল। দেশ বিদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ পণ্যসম্ভারগুলি জড়ো হত এই শহরে। জাঁকজমকপূর্ণ এই শহরে প্রচুর জ্ঞানীগুণীরও সমাগম ছিল। খলিফারা জ্ঞানের আদর করতে জানতেন। পণ্ডিতরা প্রচুর মাসোহারা পেতেন। ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যে বাগদাদ শহর বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপলকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আব্বাসী বংশের রাজত্বের সময় সাম্রাজ্যের অনেকাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে অনেক সময় এই রাজত্বকালকে সাম্রাজ্যের অবনতির যুগ বলে ধরা হয়। কিন্তু এই সময় আরব সভ্যতা চরম পরিণতি লাভ করেছিল এবং বাইরের জগতেও ঘটেছিল তার প্রচুর পরিচিতি।

স্পেনে মুসলমান সাম্রাজ্য ঃ—অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্পেনে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। আব্বাসী বংশের প্রতিষ্ঠার পর আব্দুর রহমান নামে একজন ওম্মায়া বংশীয় রাজপুত্র সুদূর পশ্চিমে পলায়ন করেন ও স্পেনে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তৃতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। স্পেনে মুসলমান খলিফাদের উপাধি ছিল আমীর। তৃতীয় আব্দুর রহমান সর্বপ্রথম খলিফা উপাধি ধারণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হাকিমের ছিল প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ।

কর্ডোভা—স্পেনে মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। আয়তনে লোকসংখ্যায়, ঐশ্বর্য, শিক্ষা এবং বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে রাজধানী কর্ডোভা প্রায় কনস্টাণ্টিনোপলের সমকক্ষ ছিল। দ্বিতীয় হাকিমের সময় কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় খুব প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। নানাদেশ থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে অধ্যায়ন করতে আসত। সেখানে সাতশ মসজিদ, তিনশ স্নানাগার, সতেরটি গ্রন্থাগার, অসংখ্য বইয়ের দোকান এবং বড় বড় বাড়ী ছিল। সেখানে সুলতানরা একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কথিত

আছে সেখানে প্রায় চার লক্ষ গ্রন্থ ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে এমন একটা সময় এসেছিল যখন অ্যারিস্টটল্-এর দর্শন ও তর্কশাস্ত্র, সনাতন সাহিত্য, প্রাচীন ভেষজশাস্ত্র গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি অবহেলিত হচ্ছিল। কর্ডোভায় এই সমস্ত বিষয়গুলি নূতনভাবে আলোচিত হতে থাকে। সনাতন জ্ঞানের এই নূতন চর্চা ধীরে ধীরে প্যারিস, অক্সফোর্ড প্রভৃতি খ্রীষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। কর্ডোভা এক সময় খুব বড় একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। আজও কর্ডোভা চামড়া ও জলপাইয়ের জন্য বিখ্যাত।

গ্রানাডা ঃ—মধ্যযুগে দক্ষিণ স্পেনের একটি সুন্দর শহর হল গ্রানাডা। এক সময় এই ছোট শহরকে কেন্দ্র করে একটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কথিত আছে এক সময় গ্রানাডা শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল চার লক্ষ। এই শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব বিখ্যাত ছিল। এই শহরের আলহাম্বা প্রাসাদ জগৎবিখ্যাত। ডারো নদীর তীরে একটি পাহাড়ের উপর এই প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল, আলহাম্বা কথাটির অর্থ হল লাল। প্রাসাদটির বাইরের দেওয়াল লাল ইট দিয়ে তৈরী হয়েছিল বলে এর নাম আলহাম্বা বা লাল প্রাসাদ। শ্বেত পাথর আর রঙিন টালি দিয়ে প্রাসাদটি গঠিত। প্রাসাদটির বাইরের তোরণে আছে স্থাপতির দ্বারা নির্মিত একটি হাত, আর ভেতরের তোরণে আছে একটি চাবি, মানুষ বিশ্বাস করত যতদিন পর্যন্ত না বাইরের হাতটি ভেতরের চাবিটিকে স্পর্শ করতে পারবে ততদিন পর্যন্ত কোন বহিঃশত্রু এই প্রসাদটিকে অধিকার করতে পারবে না। এই প্রাসাদের ভেতরে একটি অপূর্ব ফোয়ারা রয়েছে। বারোটি শ্বেত পাথরের সিংহ এই ফোয়ারাটিকে ধারণ করে রেখেছে। এই প্রাসাদের একটি মিনারে রয়েছে একটি বড় ঘণ্টা। কোন নিঃশব্দ রাতে এই ঘণ্টাটি বাজালে কুড়ি মাইল দূর থেকে তার ধ্বনি শোনা যেত। গ্রানাডা শহরেই রয়েছে একটি বড় গির্জা। তার নাম গ্র্যানাডা ক্যাথেড্রাল। এইখানে বত্তিচেল্লি, এল গ্রেকো, রিবেরা প্রভৃতি শিল্পীদের আঁকা ছবি রয়েছে।

ইসলাম ও ইউরোপের প্রতিক্রিয়া ঃ—ইসলাম ধর্ম একেশ্বরবাদী হলেও তার প্রচারকে ইউরোপ মেনে নিতে পারেনি। ওম্মিয়া যুগে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে আরবদের অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলেছিল। ফরাসী দেশে টুরের যুদ্ধে (৭৩২ খ্রীঃ) বীর চালর্স মার্টেল আরবদের পরাজিত করেন ও পশ্চিম ইউরোপকে মুসলমান আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। এর প্রায় তিনশ চৌষট্টি বছর পরে খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড) ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি দেশের সর্বস্তরের মানুষ যোগ দিয়েছিল। পিসা, ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি স্থানের বণিকরা বিশেষ করে এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিল। এসব সত্ত্বেও

ইসলামধর্মাবলম্বী আরবদের জ্ঞান ও সংস্কৃতি ইউরোপের চিন্তাধারার উপর প্রভাব ফেলেছিল।

আসলে মুসলমানরা যে সর্বত্র ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিল তা নয়। যেমন স্পেনের মুসলমানরা খুব মননশীল ছিল। তাই সেখানে শিল্পের যে বিকাশ এবং জ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটেছিল তা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইয়োরোপ অস্বীকার করতে পারেনি। কর্ডোভার চর্মশিল্প এত উন্নত ছিল যে সেখানকার পণ্যদ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানী হত। ১৪৯২ সালে পঞ্চম ফার্ডিনান্ড (Ferdinand V) স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু তার আগেই স্পেন থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আসলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা পূর্বদিকে বাইজানটাইন, এবং পশ্চিম দিকে পশ্চিম ইউরোপের রাজাদের প্রতিকূলতায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভারতবর্ষ, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি কতকগুলি অঞ্চলে নিজেদের রাজ্য গড়ে তোলে। এই সমস্ত স্থানের জ্ঞান-বিজ্ঞান—যেমন ভারতবর্ষ থেকে সংখ্যাতত্ত্ব, গ্রীসের প্রাচীন দর্শন, আরব জগতের গণিত, রসায়ন ও ভেষজশাস্ত্র ইত্যাদি মুসলমানদের মধ্যে বিকাশলাভ করে, আর তাদের কাছ থেকে তা প্যারিস, অক্সফোর্ড ইত্যাদি খ্রীষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীষ্টান জগৎ ইয়োরোপে মুসলমান সাম্রাজ্যকে সহ্য করতে পারেনি, কিন্তু তাদের জ্ঞানের কাছে নতি স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি।

বিশ্ব শিল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আরবদের দানঃ—আরবদেশ বণিকদের দেশ। নানা দেশ, নানা সভ্যতার সাথে ছিল তাদের যোগাযোগ। নানাদেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রভাবেই আরব সভ্যতা গড়ে ওঠে। তারা জ্যোতির্বিদ্যা ও অংকশাস্ত্রের জ্ঞান পেয়েছিল ভারতবর্ষের কাছ থেকে। পারস্যের কাছ থেকে শিখেছিল সাহিত্য, শিল্পানুরাগ রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা এবং আহার ও বেশভূষা। গ্রীক দর্শন ও চিকিৎসাবিজ্ঞান তাদের প্রভাবিত করেছিল। নিজেদের উদ্যম ও উৎসাহে তারা এই জ্ঞানভাণ্ডার আরো বর্ধিত করেছিল।

বিশ্বের কাছে আরবদের প্রধান দান হল শিক্ষানুরাগ। তাদের বিশাল সাম্রাজ্যে ছিল বহু বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার। বিশেষ করে স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু পণ্ডিত অধ্যয়ন করতে আসতেন। ফলে ইউরোপের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছিল। এক থেকে শূন্য পর্যন্ত লেখার প্রণালী ইউরোপে শিখেছিল আরবদের কাছ থেকে; আরবরা শিখেছিল ভারতবর্ষের কাছ থেকে।

ভারতের কাছ থেকে দশমিক এবং বীজগণিত ও গ্রীকদের কাছ থেকে জ্যামিতির জ্ঞান লাভ করে নিজেরা অনেক নূতন জিনিস প্রবর্তন করে।

জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং রসায়নশাস্ত্রে তারা অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। কাগজ তৈরী করার প্রণালী ইউরোপ শিখেছিল আরবদের কাছ থেকে। আরবরা শেখে চীনদেশের কাছে।

এ ছাড়াও আরবদের অন্যান্য দান ছিল। কাপড় বোনা, কাঁচ ও চামড়ার কাজ, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, সিরাপ ও আতর তৈরীর কাজে তাদের ছিল অপূর্ব দক্ষতা। ইয়োরোপ তাদের কাছে শিখেছিল আখের চাষ এবং আখ থেকে চিনি প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া ও জমিতে সার দেওয়া এবং নানারকম ফুল ও ফলের চাষ।

মধ্যযুগের আরব মনীষী—মধ্যযুগে বেশ কয়েকজন আরবপণ্ডিত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সর্ববিষয়েই আরবপণ্ডিতগণের ছিল আগ্রহ। রসায়নে বিশেষজ্ঞ ছিলন হুনাইন, চিকিৎসা ও দর্শনে ইবন্ সিনা (ইয়োরোপে তিনি অ্যাভেসিনা নামে পরিচিত), বিজ্ঞানে ও দর্শনে ইবন্ রুসদ, ইতিহাসে আল্ তাবারি ও ইবন্ খলিদুন এবং ভারততত্ত্বে ছিলেন আল্-বিরুণী। আলবিরুণীর গ্রন্থের নাম ছিল 'তাহকিক-ই-হিন্দ' যার অর্থ হল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। হুনাইন সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। খলিফা মুতওয়াক্কিল তাকে অনেক পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বিষ তৈরী করতে বলেছিলেন। কিন্তু হুনাইন খলিফার আদেশ অমান্য করেন। তাকে প্রাণদণ্ডের ভয় দেখালে তিনি বলেন যে মানবজাতির ধ্বংসের জন্য তিনি কিছু করতে পারবেন না। খলিফা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন। প্লেটোর দর্শনকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন ইবন-রুসদ। সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস লেখার ধারা প্রবর্তন করেন ইবন্-খলিদুন। পরিব্রাজক ইবন্ বতুতা ভারত ও চীন দেশ সম্বন্ধে আরব দেশের উৎসাহ জাগিয়েছিলেন। আলি-আল-তাবারি চিকিৎসা শাস্ত্রে একটি গ্রন্থ লেখেন এবং মহম্মদ ইবন্ ইব্রাহিম আল ফজল সংস্কৃতগ্রন্থ 'সূর্য্য সিদ্ধান্ত'কে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

[**সংক্ষিপ্তসার**—শুষ্ক মরুভূমির দেশ দেশ আরব। এইখানে সপ্তম শতাব্দর প্রথম দিকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্ম ইসলামের জন্ম হয়েছিল। এই ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন হজরত মহম্মদ। "আল্লাহ এক। আল্লাহ ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই," হজরত মহম্মদ এই বাণী দিকে দিকে প্রচার করেছিলেন।

ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ কিছু সামাজিক সংস্কারও করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের নাম কোরাণ। এই গ্রন্থে ধর্মনীতি ও উপাসনা পদ্ধতি রয়েছে।

মহম্মদের মৃত্যুর পর খলিফাপদের সৃষ্টি হয়। খলিফায়া ছিলেন মর্তে মহম্মদের প্রতিনিধি। এই খলিফাদের মধ্যে আব্বাসীয় বংশের হারুণঅল-রশিদ একজন কিংবদন্তী পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বাগদাদ। ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যে বাগদাদ শহর বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্টান্টিনোপল্কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ইসলামের প্রচারকে ইয়োরোপ একেবারে মেনে নিতে পারে নি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে

খ্রীষ্টানরা ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড ঘোষণা করেছিল। এ সত্ত্বেও ইসলামধর্মাবলম্বী আরবদের জ্ঞান ও সংস্কৃতি ইয়োরোপের চিন্তাধারার উপর প্রভাব ফেলেছিল।

আরবদেশ বণিকদের দেশ ছিল বলে নানা দেশ নানা সভ্যতার সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। আদান-প্রদানের মাধ্যমে আরবদের বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল।

অনুশীলনী

১। ইসলাম ধর্ম কে প্রবর্তন করেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

২। ইসলাম ধর্মের মূল উপদেশ কি? ইসলাম ধর্ম বিস্তারের পেছনে প্রধান কারণ কি ছিল?

৩। প্রথম চারজন পবিত্র খলিফা সম্বন্ধে কি জান? আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা কে ছিলেন?

৪। বিশ্বসভ্যতায় আরবরা কি দান রেখে গেছে?

৫। মধ্যযুগে কয়েকজন আরব মনীষীর নাম লেখ এবং তাঁদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

একটি বাক্যে উত্তর দাও

১। 'কাবা' কি?

২। হজরত মহম্মদ কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন?

৩। কোরাণ কি?

৪। খালিফা কাদের বলা হয়?

৫। আলহাম্বার অর্থ কি?

শূন্যস্থান পূরণ কর—

১। মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে মদিনাবাসী মহম্মদের——বা সহায়ক হলেন।

২। দরিদ্রদের জন্য মহম্মদ——বা সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন।

৩। বাগদাদ ছিল——নদীর পশ্চিম তীরে।

৪। স্পেনে মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল——।

৫। এই শহরের——প্রাসাদ জগৎবিখ্যাত।

৬। ১৪৯২ সালে — স্পেন থেকে — বিতাড়িত করেন।

৭। — সংস্কৃত গ্রন্থ 'সূর্য্য সিদ্ধান্ত' কে — ভাষায় অনুবাদ করেন।

৮। — মহম্মদকে বিবাহ করেন।

৯। — সময় কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ (৮০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)

(শার্লামান (৭৪২-৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য; অভিষেকের গুরুত্ব; রাষ্ট্র ও চার্চ: রাজসভা, রাজ্য শাসন ও সংস্কার; মনাস্টারি; সেন্ট বেনেডিক্ট (৪৮০-৫৪০ খ্রীঃ); ক্লুনি শিক্ষার সংরক্ষণ ও বিস্তারে মনাস্টারিজের ভূমিকা; মেণ্ডিক্যান্ট ফ্রায়ার; অভিষেকের দ্বন্দ্ব; বিশ্ববিদ্যালয়; নূতন বিষয়ের শিক্ষা; ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক; মধ্যযুগের মনীষী।)

রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর ফ্রাঙ্ক নামে জার্মান জাতিগুলির একটি শাখা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং গল অঞ্চলে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলে; গল হল বর্তমানে ফ্রান্স। ফ্রাংকদের রাজা ছিলেন ক্লোভিস (Clovis)। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় 'মেয়র' নামে রাজপ্রসাদে অবস্থানকারী নগরপালদের হাতে। নগরপালদের মধ্যে দুজন খুব বিখ্যাত চার্লস মার্টেল এবং পুত্র পিপিন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পিপিন 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পিপিনের পুত্র শার্লামান ছিলেন ফ্রাংকদের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা। ইতিহাসে তিনি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নামে বিখ্যাত। তাঁর রাজবংশের নাম ক্যারোলিঞ্জিয়ান (carolingian) বংশ।

শার্লামান (৭৪২-৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে)—শার্লামান ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাংকদের রাজা হন। তাঁর ভাইয়ের নাম কার্লোমান। তিনিও ফ্রাঙ্কদের একটি শাখার উপর শাসন করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ৭৭১ সালে কার্লোমান পরলোক গমন করেন। তখন শার্লামান অখণ্ড ফ্র্যাংক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন।

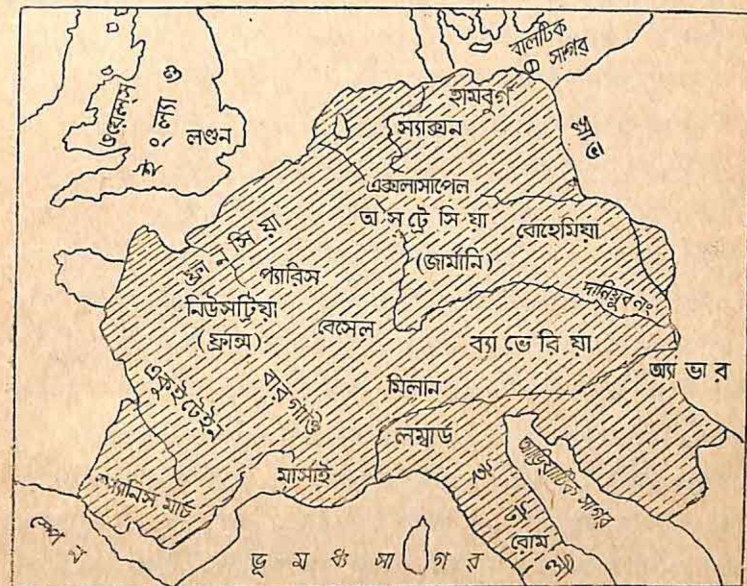


শার্লামান

শার্লামান সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন তাঁর বন্ধু ও কর্মসচিব আইনহার্ড (Einhard)। শার্লামানের উচ্চতা ছিল ছ'ফুট। তাঁর ছিল সুঠাম দেহ,গৌরবর্ণ,লম্বা নাক,দীপ্ত আঁখি; খর্ব গ্রীবা,হাল্কা কেশ,গোলমুখ,স্মিত আনন। তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল অথচ অসাধারণ রাজকীয়। তিনি জার্মান ভাষায় কথা বলতেন, ল্যাটিন

ভাষাকে সমাদর করতেন, সরল জার্মান পোষাক পরিধান করতেন এবং সর্বদা পণ্ডিত, পার্শ্বচর, দাস-দাসীর দ্বারা পরিবৃত থাকতেন। শিকার, সন্তরণ ও অশ্বারোহণ ইত্যাদি পুরুষোচিত কাজে তিনি আনন্দ পেতেন।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য—শার্লামান লম্বার্ড, স্যাক্সন, সার্ব, অ্যাভার, দিনেমার, ব্রিটন ও স্পেনের মুসলমানদের পরাজিত করে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল স্পেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইটালী। এত বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে সবাই সমীহ করতেন।



শার্লামানের সাম্রাজ্য

এমন কি খ্রীষ্ট জগতের ধর্মগুরু পোপও তাঁকে সম্মান জানাতেন। এই সময় যিনি পোপ ছিছেন তাঁর নাম লিও। লিওকে এক সময় কটু ভাষণের জন্য রোমের গির্জা থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়। শার্লামানই তাঁকে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর কিছুদিন পরে, ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টমাসের দিনে, শার্লমান রোমের সেন্ট পীটার্স ব্যাসিলিকা নামক গির্জায় উপাসনা করতে যান। তিনি যখন উপাসনা করছিলেন তখন পোপ লিও পেছন থেকে তাঁর মাথায় প্রাচীন রোমান সম্রাটদের একটি সোনার মুকুট পরিয়ে দেন। সমবেত রোমান, ফ্রাঙ্ক ও অন্যান্য জার্মানরা অভিভূত

হয়ে বলতে লাগলেন "ঈশ্বর শার্লমানকে দীর্ঘজীবন দান করুন ও তাঁকে বিজয়ী করুন ঃ ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত শার্লমান হলেন রোমানদের মহান সম্রাট।"

এই ভাবে অভিষিক্ত হয়ে শার্লমান হলেন পবিত্র রোমান সম্রাট, আর তাঁর সাম্রাজ্য হল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর একজন জার্মান রাজা আবার রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে ফিরিয়ে আনলেন। পূর্বদিকে বাইজানটিয়ামে তখন রোমান সাম্রাজ্যের একটি শাখা টিকে ছিল। তার পাশাপাশি পশ্চিম দিকে শার্লমানের সাম্রাজ্য হল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য। খ্রীষ্টজগতের ধর্মগুরু পোপ কর্তৃক অভিষিক্ত বলে এই সাম্রাজ্যের নাম পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য।

অভিষেকের গুরুত্ব—রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর শার্লমানই ছিলেন প্রথম রাজা যিনি ইটালী, গল ও জার্মানির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য ও অখণ্ডতা তিনি কিছুটা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাছাড়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য তিনি স্যাক্সনি প্রভৃতি অঞ্চলে যুদ্ধ করে খ্রীষ্ট জগতের প্রিয় হয়েছিলেন। অতএব এইবার খ্রীষ্ট জগতের সার্বভৌম মর্ত্য সাম্রাজ্যের সার্বভৌমকে বরণ করে নিলেন। পোপ লিও অবশ্য শার্লমানকে 'ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত' বলে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু বাস্তবে সম্রাট হলেন পোপের দ্বারা অভিষিক্ত। পরবর্তীকালে পোপরা দাবি করতে পারতেন যে যিনিই সম্রাট হোন না কেন; তাঁর থেকে পোপ বড়, কারণ সম্রাটের রাজমুকুট আসলে পোপের দান। পোপের এই দাবি নিয়ে সম্রাট ও পোপের মধ্যে বিরোধিতা একসময়ে খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন যে পোপের দ্বারা অভিষিক্ত এই সাম্রাজ্য আর যাই হোক পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন নয়। শার্লমানের রাজ্য ছিল ফ্রাঙ্ক, তাঁর ভাষা ছিল জার্মান এবং তাঁর রাজ্যে কোনদিন রোমান আইন ব্যবহৃত হতনা। রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শ, কাঠামো ও ব্যবস্থা কোনটাই শার্লমানের সাম্রাজ্যে ছিল না। সমসাময়িক মানুষ ভেবেছিল আগের রোমান সাম্রাজ্যই ফিরে এসেছে। আসলে যা এসেছিল তা আরেকটি সাম্রাজ্য—পোপের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে পবিত্র; রোমানদের দ্বারা স্বীকৃত হয়ে রোমান—সব মিলিয়ে নূতন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য।

রাষ্ট্র ও চার্চ—খ্রীষ্টান ধর্মের সংগঠনের নাম চার্চ। এই চার্চের প্রধান হলেন পোপ। পোপের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপে পোপের ধর্মরাজ্য যাঁরা চালাতেন তাঁরা হলেন বিশপ। বিশপদের প্রধানকে বলা হত আর্কবিশপ।

শার্লমান পোপের সাথে যেমন ভালো সম্পর্ক রাখতেন সেইরকম সমস্ত বিশপ ও আর্কবিশপদের সাথেও ভালো সম্পর্ক রাখতেন। সম্রাটের মনোনীত ব্যক্তিদের সাধারণ যাজকরা বিশপ বলে মেনে নিতেন এবং তাদের মধ্য দিয়ে সম্রাট চার্চের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতেন। শার্লমান নিজে ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং জার্মান জাতিগুলির মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের চেস্টা করেছিলেন। তাই তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের পোপ বিশপ বলে স্বীকৃতি দিতেন। প্রয়োজন হলে ধর্মীয় সংগঠনকে শার্লমান নিজের ইচ্ছামত সংস্কার করতেন এবং এ বিষয়ে কারও মত তিনি গ্রাহ্য করতেন না। খ্রীস্টধর্মের মধ্যে তত্ত্বগত বিরোধ মেটানোর জন্য তিনি মাঝে মাঝে 'সাইনড' বা ধর্মসভার আয়োজন করতেন। ৭৯৪ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত এই রকম একটি অধিবেশনে শার্লমান নিজে পৌরোহিত্য করেন। খ্রীষ্টান চার্চের সাথে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাটের অসাধারণ সুসম্পর্ক মধ্যযুগের প্রথম পর্বে ইয়োরোপের ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা। সম্রাট ছিলেন বর্বর জার্মান পরিবেশ ও বেষ্টনীর মধ্যে আটকে থাকা রোমান খ্রীষ্টীয় চার্চের রক্ষক। যতদিন সম্রাটরা চার্চের রক্ষক হবার ক্ষমতা রাখতেন ততদিন কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি। পরবর্তী সম্রাটরা দুর্বল হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যের উপর চার্চ খবরদারি করার চেষ্টা করে। তখনই শুরু হয় সাম্রাজ্যের সাথে চার্চের সংঘাত।

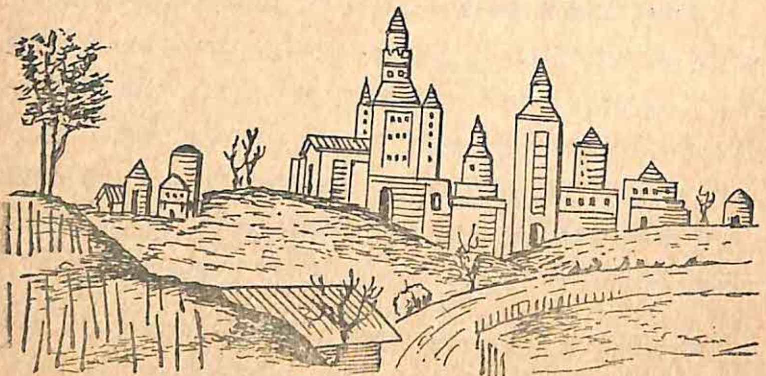
রাজসভা, রাজ্যশাসন ও সংস্কার—সমস্ত প্রশাসনের প্রধান ছিলেন সম্রাটরূপে শার্লমান নিজে। তিনি যখন যেখানে থাকতেন তখন সেখানে তাঁর রাজসভা বসত। মন্ত্রী বলতে যা বোঝায় সেইরকম কোন উপদেষ্টা শার্লমানের ছিল না। তার বদলে ছিল কিছু কর্মচারী, যেমন মার্শাল, বাটলার, চেম্বারলেন, স্টুয়ার্ট ইত্যাদি। মিসি ডমিনিসি নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী সংবাদ সরবরাহের কাজ করত। শার্লমানের সাম্রাজ্যের সীমান্ত বিভাগগুলিকে বলা হত মার্ক্স। তাদের শাসকদের বলা হত মারগ্রেভস্।

শার্লমানের রাজধানী আখেন নগরীকে বলা হত 'নূতন রোম', কারণ রোমান স্থাপত্যের অনুকরণে এখানে অনেক প্রাসাদ ও গির্জা নির্মাণ করা হয়েছিল। শার্লমানের যুগে প্রাসাদের অভ্যন্তরে মোজাইকের কাজ খুব উন্নত হয়েছিল। নগর প্রতিষ্ঠা, সেতু নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদি কাজে রোমান কারিগরি বিদ্যার পুনরুদ্ধারের চেস্টা করা হয়েছিল।

শার্লমান অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আলকুইন অফ ইয়র্ক, পল দ্য ডিকন, পিটার অফ পিসা, থিওডাল্ফ প্রভৃতি পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। শার্লামান নিজে, তাঁর পুত্রকন্যারা এবং রাজপ্রাসাদের বিপুল সংখ্যক কর্মচারীরা ছিলেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। শার্লামান যখন যেখানে যুদ্ধ করতে যেতেন তখন সেখানে ছোট একটি বিদ্যালয়ও থাকত। বালিশের নীচে কাগজ ও কলম রেখে শুতেন যাতে ঘুম ভাঙ্গলেই তিনি অক্ষর লেখার চেষ্টা করতে পারেন। তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে একশ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন যারা আহারের সময়, কিংবা বিশ্রাম ও শোওয়ার সময় সম্রাটকে কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করে শোনাতে পারে। শার্লামান নিজে মঠে মঠে বিদ্যালয় স্থাপন এবং পুস্তকের নকল লিখে রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সময় পুঁথি লেখা হত চামড়ায়। মঠগুলিতে যাতে চামড়ার সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকে তার দিকেও তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই সময় ইয়োরোপে জ্ঞানের পুনর্জাগরণ হয়েছিল। একে বলা হয় ক্যারোলিঞ্জিয়ান রেনেশাঁস। এই যুগেই আইনহার্ড লিখেছিলেন তাঁর 'লাইফ অফ চারলস' (শার্লামানের জীবনী) ও পল তাঁর 'হিস্টরি অফ দ্য লম্বার্ডস' (লম্বার্ডদের ইতিহাস) লিখেছিলেন।

মনাস্টারি—রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের কিছুকাল পরে যেমন এক নূতন সাম্রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপের রাজনৈতিক ঐক্য ফিরে এসেছিল,



মনাস্টারি বা মঠ

সেই রকম ইয়োরোপের বিভিন্ন মঠ ও সন্ন্যাসীদের প্রচেষ্টায় ধর্মের ক্ষেত্রেও এক নূতন ঐক্য দেখা দিচ্ছিল। ঈশ্বরের আরাধনা ও মানুষের সেবা ছিল সন্ন্যাসীদের আদর্শ। তাঁরা মঠে থাকতেন। সেখানে সংঘ-কেন্দ্রিক প্রশাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল ধর্মজীবনের ঐক্য।

ইয়োরোপের মঠগুলিকে বলা হত মনাস্টারি (Monastery)। মনাস্টারি বলতে এক সময়ে বোঝাত ছোট্ট কুটীর। পরে মনাস্টারি কথার অর্থ দাঁড়াল মঠ এবং মঠের বাসিন্দারা যারা সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে ঈশ্বর সেবা করতেন। মঠের পুরুষ সন্ন্যাসীদের বলা হত মঙ্ক এবং স্ত্রী সন্ন্যাসীদের বলা হত নান।

যাঁরা সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁরা বিদ্যান্বেষণের জন্য, সংসারের গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্য কিংবা সৈন্যের কঠোর জীবন থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। প্রথমদিকে সন্ন্যাসীরা খুব কঠোর জীবন-যাপন করতেন। তাঁরা লোকালয় থেকে দূরে থাকতেন, পর্ণকুটীর, গুহা ইত্যাদিতে বাস করতেন, বিবাহ না করে, সামান্য আহার গ্রহণ করে অসাধারণ কৃচ্ছ্র সাধন করতেন। ম্যাকারিয়াস, বেসারিয়ন, সিমিয়ন, স্টাইলাইটস নামে কয়েকজন সন্ন্যাসী এই রকম কৃচ্ছ্রসাধন করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র উপবাস ও উপাসনার কষ্টসাধ্য জীবনকে সংযত করার চেষ্টা করেছিলেন সেণ্ট প্যাকোমিয়াস ও সেণ্ট বেসিল নামে দুই সন্ন্যাসী। পরবর্তী কালে সেণ্ট বেনেডিক্ট নামে আরেকজন সন্ন্যাসী বিদ্যাচর্চা ইত্যাদি অর্থবহ কাজে সন্ন্যাসী-জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন।



একজন মঙ্ক

সেণ্ট বেনেডিক্ট (৪৮০-৫৪০খ্রীঃ)—সংহতির অভাবে এবং অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মনাস্টারিগুলির অবক্ষয় হতে থাকে। এই অবক্ষয়ের হাত থেকে মনাস্টারিগুলিকে রক্ষা করেছিলেন সেণ্ট বেনেডিক্ট নামে একজন সন্ন্যাসী। তিনি নার্সিয়া নামক স্থানে এক অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন। যৌবনে ইটালীর রোমান সমাজের পতন ও স্খলন দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন এবং সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে স্যাবাইন পাহাড়ের নির্জনতায় আত্মগোপন করে সাধনা করেছিলেন। পরে ইটালীর মণ্ট ক্যাসিনোতে তিনি একটি মঠ নির্মাণ করেন।

সেণ্ট বেনেডিক্ট নিয়ম করেছিলেন যে, প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে দীন, অনুগত ও সৎ হতে হবে (poverty, chastity and obedience)। তাঁরা দিনের এক তৃতীয়াংশ সময়, অর্থাৎ আটঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমাতে পারবেন। অবশিষ্ট সময়ে তিনটি প্রধান কাজ করতে হবে—প্রাত্যহিক উপাসনা, উদ্যান-রচনা ও কৃষিকাজ এবং পঠন-পাঠন ও পুস্তকের অনুলিখন বা নকল করা। এইভাবে প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে আলস্য বিসর্জন দিতে হল। তাছাড়া সেণ্ট বেনেডিক্ট নিয়ম করেছিলেন যে মনাস্টারির পূর্ণ সভ্য হবার আগে প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে 'নভিসিয়েট' বা শিক্ষানবিশ পালন করতে হবে। প্রত্যেক মনাস্টারির অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী-সদস্যরা তাঁদের মধ্যে একজনকে প্রধান বা অ্যাবট নিযুক্ত করবেন। সমস্ত জীবনের জন্য তিনি থাকবেন সংঘের প্রধান বা অ্যাবটের অনুগত। যাবতীয় নিয়োগের কর্তৃত্ব থাকবে তাঁরই এবং তাঁর নির্দেশ হবে অলংঘ্য। এইভাবে মনাস্টারির প্রশাসন হল কঠিন, জীবন হল সরল।

ক্লুনি—সেণ্ট বেনেডিক্ট যে নিয়ম করেছিলেন তা প্রায় পাঁচশ বছর ইয়োরোপে মনাস্টারির সংগঠনকে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবার মনাস্টারিগুলির অধঃপতন ঘটতে থাকে। তখন মনাস্টারির ভেতরের দুর্নীতিকে অপসারণ করে সেণ্ট বেনেডিক্টের নিয়মাবলীতে ফিরে যাওয়ার জন্য এক নূতন আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন শুরু হয় ক্লুনির মঠে। ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আকুইটেনের ডিউক উইলিয়াম নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই মঠটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মঠটি ছিল বার্গাণ্ডিতে। পরে এইখান থেকে ক্লুনির আন্দোলন ইটালী, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। ক্লুনির আদর্শ ছিল প্রধানতঃ তিনটি—রাজা ও লোভী সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মনাস্টারিগুলিকে রক্ষা করা, স্বাধিকার সচেতন বিশপদের ক্ষমতাকে খর্ব করে পোপের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনা এবং সম্পত্তি প্রভৃতি জাগতিক বিষয় থেকে সন্ন্যাসীদের ফিরিয়ে এনে, তাদের অকৃতদার রেখে ধর্মের পথে তাদের চালিত করা। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ক্লুনির আন্দোলন একটি মহাদেশীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। হিল্ডেব্রাণ্ড নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন ক্লুনি আন্দোলনের বড় সমর্থক। সন্ন্যাসীদের সম্পত্তিকে মঠের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে আনা এবং রাজা ও তাঁর সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করা—এই দুই ঘটনার মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রের পরাভব সূচিত হয়েছিল আর পোপের প্রতি আনুগত্যের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপের ধর্মীয় ঐক্যকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল।

শিক্ষার সংরক্ষণ ও বিস্তারে মনাস্টারির ভূমিকা :—মধ্যযুগে শিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল মনাস্টারি। সেণ্ট বেনেডিক্টের নিয়ম অনুযায়ী অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পুস্তকের অনুলিখন, পুস্তক রচনা ইত্যাদি ছিল সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন কাজ। এর ফল ছিল তিনটি—প্রথমতঃ, অনেক পুঁথি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়, দ্বিতীয়তঃ, অনেক নূতন পুস্তক রচিত হয় এবং তৃতীয়তঃ, ইয়োরোপের সনাতন সাহিত্য ও ল্যাটিন ভাষায় সন্নাসীরা যে বই লিখেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জোয়াভিল রচিত **সেণ্টলুইসের জীবনী**, **ভিলেহারডুইন** রচিত **চতুর্থ ক্রুসেডের ইতিহাস**, **ফ্রোয়াসার্ট ও ভিলানির গল্প** ইত্যাদি। মনাস্টারির মধ্যে ছিল বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মহাফেজখানা, মুসাফেরখানা, ব্যাংক, উপাসনালয় এবং এমনকি রাজনীতি, কূটনীতি, স্থাপত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনার স্থান। ফলে সমাজের বিভিন্ন ধরণের মানুষ মঠে আসত এবং সেখান থেকে বয়ে নিয়ে যেত সভ্যতার আলো। সন্ন্যাসীরা ছিলেন বলেই বর্বরদের অধিপত্য সত্ত্বেও মধ্যযুগে ইয়োরোপে অন্ধকারের গাঢ় ছায়া নেমে আসেনি।

মেণ্ডিক্যাণ্ট ফ্রায়ার :—ক্লুনির আন্দোলনও মঠের দুর্নীতিকে দূর করতে পারেনি। তাই একদল সন্ন্যাসী সরল দীন জীবন, বিষয়াসক্তিহীন ধর্মচর্চা ও ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে ধর্মজীবনে নূতন দিগন্ত খুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মেণ্ডিক্যাণ্ট ফ্রায়ার বলা হয়।

অভিষেকের দ্বন্দ্ব :—জাগতিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট এবং ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর পোপ, এ দুজনের মধ্যে কে বড়, সম্রাটকে কে অভিষিক্ত করবেন পোপ, না সম্রাট নিজে—এই প্রশ্ন নিয়ে মধ্যযুগে পোপের সাথে সম্রাটের বিরোধ হয়। এই বিরোধকেই **অভিষেকের দ্বন্দ্ব** (Investiture Contest) বলা হয়। রাজ্যের দাবিকে উপস্থিত করেছিলেন **সম্রাট অটো** এবং পোপের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পোপ **সপ্তম গ্রেগরী**।


সম্রাট অটো

পোপ বলতেন তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, পৃথিবীতে তাঁর থেকে বড় কেউ হতে পারে না। সম্রাট বলতেন যে যাবতীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি তাঁর রাজ্যে অবস্থিত, তিনিই তাদের রক্ষক। অতএব তাঁর শাসন অবিসংবাদিত। পোপ লিও সম্রাট শার্লমানকে অভিষিক্ত করেছিলেন বলে পোপের দাবিকে অস্বীকার করা কঠিন ছিল। প্রায় তিনশ বছর এই দ্বন্দ্ব চলেছিল। এই দ্বন্দ্বের শুরু হয় ১০৭৫ সালে। এক সময় সম্রাট বিশপদের অভিষিক্ত করতেন। ১০৭৫ সালে পোপ গ্রেগরী রোমের একটি ধর্মসভায় ঘোষণা করলেন যে এর পর থেকে সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে যিনি বিশপের পদ গ্রহণ করবেন তাঁকে আর ধর্মজগতের লোক বলে ধরা হবে না। এই ঘোষণার অর্থ হল সম্রাটের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। এই ঘটনার পর থেকেই অভিষেকের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (১১৫৯-১১৮১) নামে একজন পোপ সম্রাট ফ্রেডারিককে পোপের প্রাধান্য মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। ১১৭৯ সালে একটি ধর্মসভায় পোপের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এর পরেও পোপের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয়েছিল। তৃতীয় ইনোসেণ্ট নামে একজন পোপ সমস্ত ইউরোপে পোপের অবিসংবাদিত ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় :—শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট অবদান। সুপ্রাচীন কালে আমারা **অ্যারিস্টটলের লাইসিয়াম, প্লেটোর অ্যাকাডেমি, আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম বাগদাদ ও কায়রোর দার-আল্‌-হিখমা** ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা শুনি। মধ্যযুগের শুরুতে বিভিন্ন মঠের সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিতে যাজক শিক্ষকদের অধীনে ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি শিক্ষাদান করা হত। শার্লমানের সময়ে মঠের বাইরেও বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে লিওনস্, ফুল্ডা, করভে, রেইমস্ ইত্যাদি বিদ্যালয়গুলি বিখ্যাত হয়েছিল। এখানে ধর্মতত্ত্বের সাথে পড়ানো হত ট্রিভিয়াম বা ভাষাতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও কোয়াড্রিভিয়াম বা সঙ্গীত, গণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কয়েকটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজের থেকেই গড়ে উঠত। দূর-দূরান্তের ছাত্ররা আসত পণ্ডিতদের কাছে, আর তাদের ঘিরে গড়ে উঠত বিশ্ববিদ্যালয়। বিখ্যাত পণ্ডিত অ্যাবেলার্ডকে কেন্দ্র করে দ্বাদশ শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর তিনটি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হল **প্যারিস, বোলোনা ও স্যালার্নো** বিশ্ববিদ্যালয়। প্যারিস

প্রসিদ্ধ ছিল ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষার জন্য, আইনের জন্য বোলোনা এবং চিকিৎসা বিদ্যার জন্য স্যালার্ণো। স্যালার্ণো ছিল গ্রীক, ল্যাটিন, ইহুদী ও আরব সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র। ইংল্যাণ্ডে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ড এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

নূতন বিষয়ের শিক্ষা :—যে যুগে ইয়োরোপে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সেই যুগে নূতন নূতন বিষয়ের চর্চাও আরম্ভ হয়েছিল। বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে মানুষ আইন, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়ে। ফলে রোমান আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি পঠিত হতে লাগল এবং ধর্মতত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র নূতন আলোতে আলোচিত হতে লাগল। আগেই মঠে মঠে ল্যাটিন ভাষাচর্চা ও ইউরোপের ধ্রুপদী সাহিত্যের চর্চা চলছিল। এই বার সেই চর্চা বাড়ল। এর সাথে শুরু হল কিছু কিছু স্থাপত্য ও শিল্পকলার চর্চা, কারণ তখন স্থানে স্থানে নগরপত্তন, দুর্গনির্মাণ ইত্যাদির যে কাজ চলছিল তা স্থাপত্য ও শিল্পচর্চার অভাবে সম্ভব হত না।

ছাত্র শিক্ষা সম্পর্ক :—বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তির প্রথম দিকে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্পর্কটাই বড় ছিল। এই সম্বন্ধ ও সান্নিধ্যের ফলে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের বিদ্যাবত্তা নির্ণয় করা সহজ ছিল। ছাত্ররা বাঁধানো মেঝেতে বসে বক্তৃতা শুনত, গুরুর পুঁথিপত্র ব্যবহার করত এবং গুরুর সাথে সম্মিলিতভাবে 'গিল্ড', 'নেশন' ইত্যাদি নামে সংঘ গঠন করত। কিন্তু কিছুকাল পরে ইয়োরোপের বিভিন্ন নগরে ছাত্রসংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে শিক্ষকের সাথে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ছাত্রদের অনেক স্বাধীনতা ছিল এবং তাদের অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মাঝে মাঝেই শহরে গোলমাল দেখা দিত।

মধ্যযুগের মনীষী :—মধ্যযুগে স্কুলম্যান' (অনুশীলক) নামে অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সাথে গ্রীকবিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। অন্ধভাবে কোন কিছুকে না মেনে তাঁরা যুক্তি দিয়ে সবকিছুকে বুঝবার চেষ্টা করতেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন অ্যাবেলার্ড, অ্যালবার্ট, ম্যাগনাস, টমাস আকুইনাস ও রজার বেকন। প্রথম তিনজন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যাপনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অ্যাবেলার্ড খ্রীষ্টধর্মকে অন্ধভাবে মানতে চাননি বলে যাজকদের সাথে তাঁর বিরোধ হয়েছিল। মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাসকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন টমাস আকুইনাস। তিনি আঠারোটি গ্রন্থ লেখেন। তাঁর গুরু ছিলেন

আলবার্ট ম্যাগনাস। তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি

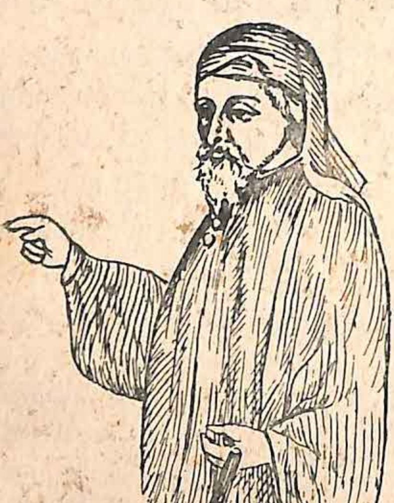


রজার বেকন



দান্তে

বিজ্ঞান দর্শনের উপর অনেক গ্রন্থ লেখেন। মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন রজার বেকন। রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের আবির্ভাব এবং মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের কথা তিনি সাড়ে ছশ বছর আগে ভবিষ্যত বাণী করেন। মধ্যযুগে ইয়োরোপে দুজন বড় সাহিত্যিক জন্মে ছিলেন—ইটালীর দান্তে ও ইংল্যাণ্ডের চসার। দান্তের কাব্য 'ডিভাইন কমেডি' ও চসারের কাব্য 'ক্যাণ্টারবেরী টেলস্' পৃথিবী বিখ্যাত।



চসার

সংক্ষিপ্তসার :—৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর একজন জার্মান রাজা রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি হলেন শার্লামান। খ্রীষ্ট জগতের ধর্মগুরু পোপের দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন বলে তাঁর সাম্রাজ্যকে বলা হত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এবং তিনি ছিলেন পবিত্র রোমান সম্রাট।

পোপ কর্তৃক সম্রাটের অভিষেকের গুরুত্ব পরে খুব বৃহদাকারে দেখা দিয়েছিল। জাগতিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট বড় না ধর্মরাজের অধীশ্বর পোপ বড় এ নিয়ে মধ্যযুগে যে বিরোধ বেধেছিল তার নাম অভিষেকের দ্বন্দ্ব বা Investiture Contest। প্রায় তিনশ বছর এই দ্বন্দ্ব চলেছিল।

মধ্যযুগে পশ্চিম ইয়োরোপে শিক্ষার মূলকেন্দ্র ছিল মনাস্টারি। এ সময়ে মঠের দুর্নীতিকে দূর করার জন্য ক্লুনির মঠে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই যুগের আরেকটি বিশিষ্ট অবদান হল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিষয়ের চর্চাও আরম্ভ হয়েছিল, এবং স্কুলম্যান (অনুশীলক) নামে একদল পন্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। শার্লামান কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

২। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বলিতে কি বোঝায়? কেমন করে এই সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল?

৩। পোপ কর্তৃক শার্লামানের অভিষেকের গুরুত্ব কি? পরবর্তীকালে এই নিয়ে কি দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল?

৪। শার্লামানের সময় রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্ক কি ছিল? পরবর্তীকালে এই সম্পর্ক কি দাঁড়িয়েছিল?

৫। শার্লামানের রাজ্যশাসন ও সংস্কার বর্ণনা কর।

৬। মনাস্টারি কি? কাদের মঙ্ক ও নান বলা হত? সেণ্ট বেনেডিক্ট মঙ্ক ও নানদের জীবন পদ্ধতির কি নিয়ম রচনা করে গিয়েছিলেন?

৭। ইয়োরোপে শিক্ষার ক্ষেত্র মনাস্টারিগুলির কি ভূমিকা ছিল?

৮। ইয়োরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব কি ভাবে হয়েছিল? বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক কি ছিল।

৯। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের কয়েকজন মনীষীর অবদান বর্ণনা কর।

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। খ্রীষ্টান ধর্মের সংগঠনের নাম কি ছিল?

২। বিশপদের প্রধানকে কি বলা হত?

৩। 'লাইফ অফ-চারলস্' এর রচয়িতা কে ছিলেন?

। ইয়োরোপের মঠগুলিকে কি বলা হত?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১। মঠের পুরুষ সন্ন্যাসীদের বলা হত——এবং স্ত্রী সন্ন্যাসীদের বলা হত——।

২। মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন——।

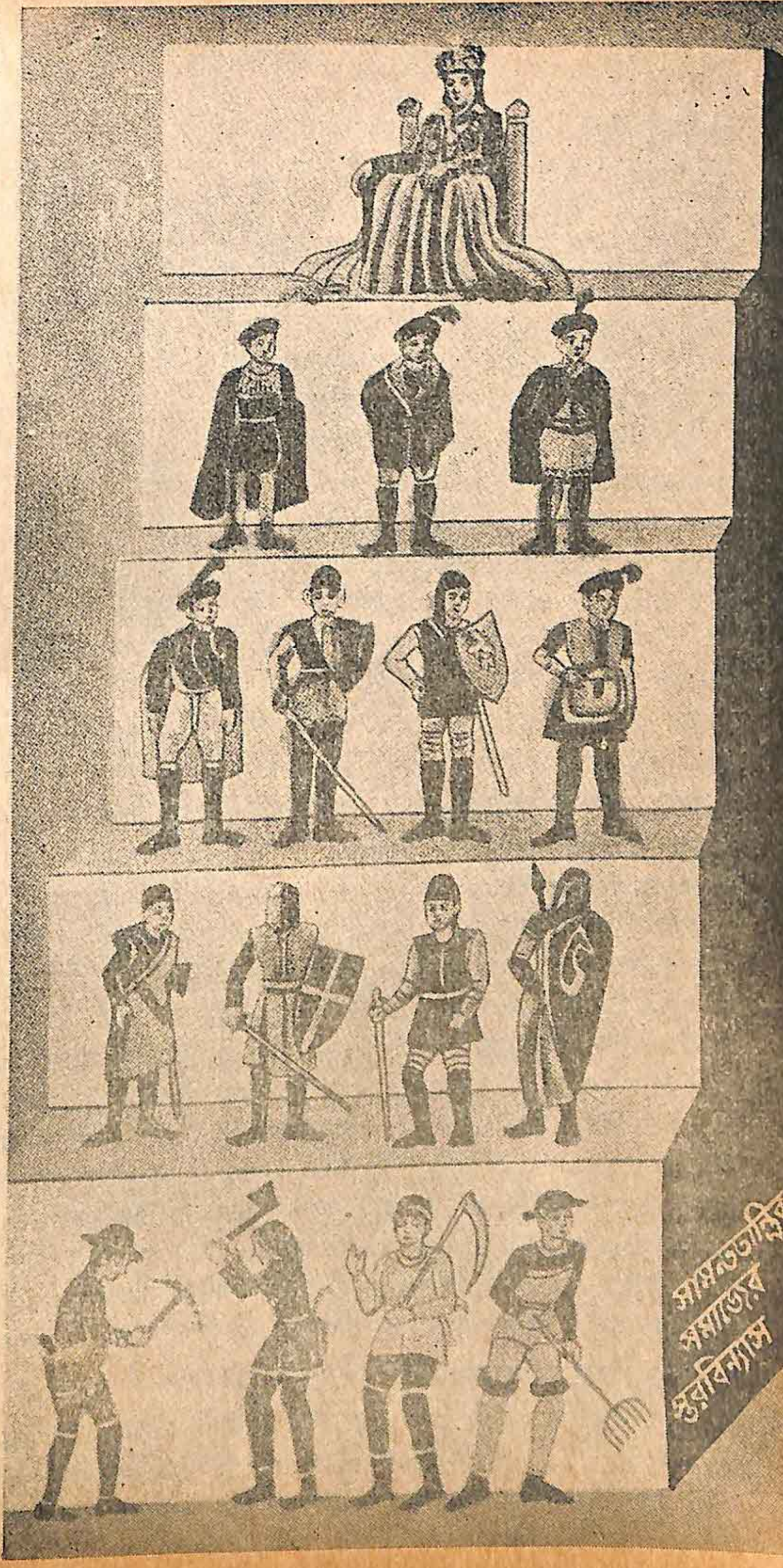
৩। দান্তের কাব্য——ও চসারের কাব্য——পৃথিবী বিখ্যাত।

মধ্যযুগের ইয়োরোপের সামন্ততন্ত্র

[সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ ; দুর্গ ও অশ্বারোহী বাহিনী ; শিভ্যালরি; ত্রুবাদুর ; ম্যানর ; সামন্তযুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ; কৃষিকার্য ও কর ব্যবস্থা ; সামন্ত যুগের সমাজ ; কৃষক বিদ্রোহ।]

মধ্যযুগে ইয়োরোপে এমন একটা সময় এসেছিল যখন রাজার ক্ষমতা কমতে থাকে। রাজার ক্ষমতা দখল করে নেয় ছোট বড় অসংখ্য আঞ্চলিক প্রভু। রাজার নীচে ছিল বড় প্রভু, তাদের নীচে মাঝারি প্রভু এবং তাদের নীচে ছোট ছোট প্রভু—এইভাবে তৈরি হল একটা ক্ষমতার সোপান। সবচেয়ে নীচে রইল কৃষকরা। জীবিকা ও নিরাপত্তার জন্য কেউ আর রাজার কাছে যেত না, যেত আঞ্চলিক প্রভুদের কাছে। ফলে সমাজে শাসনের চেহারা বদলে গেল, আর বদলাল শোষণের রূপ। কৃষকদের শোষণ করে আঞ্চলিক প্রভুরা বেঁচে থাকত, অথচ তারা শাসন করত কৃষকদেরই। সমাজের শ্রম দিত কৃষকরা, আর বিনাশ্রমে বেঁচে থাকত প্রভুরা। এইভাবে তৈরি হল এক অদ্ভুত সমাজ। এই সমাজের নাম সামন্ত সমাজ।

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঃ পৃথিবীতে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হঠাৎ শুরু হয় না। সামন্ততন্ত্রও হঠাৎ শুরু হয়নি। প্রাচীনকালে রোমে সাধারণ মানুষ দুর্দশায় পতিত হলে ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয়ে চলে যেত। আশ্রয়দাতা আর আশ্রিতের মধ্যে তখন দেখা দিত নূতন সম্পর্ক, যা উধ্বর্তন ও অধঃস্তনের সম্পর্ক। এই ব্যবস্থাকে বলা হত 'ক্লায়েণ্টেজ' (Clientage)। আবার যখন কোন কারণে দেশে চাষ-আবাদ ব্যাহত হত তখন যাতে কৃষকরা পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হত। কৃষকদের ভাগ্য তখন জমির সাথে আটকে থাকত। এই কৃষকদের বলা হত 'কলোনি' (Colony) বা 'সার্ফ' (Serf), আর এই ব্যবস্থাকে বলা হত কলোনেট' (Colonate)। অনেক সময় কৃষিকার্যকে চালু রাখার জন্য কৃষকদের জমিদান করা হত। একে বলা হত 'প্রিকারিয়াম' (Precarium)। পরবর্তীকালে প্রিকারিয়ামের ধারায় জমি দানের নূতন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাকে বলা হত 'বেনেফিস' (Benefice)। বেনেফিসের দখলদারদের কখনো কখনো নানাবিধ কর থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হত। একে বলা হত 'ইমিউনিটিজ' (Immunities)। পরবর্তীকালে যখন ভাইকিং, মেগিয়ার, স্যারাসেন প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলির আক্রমণে ইউরোপে স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা


সামন্ততান্ত্রি
সমাজের
স্তরবিন্যাস

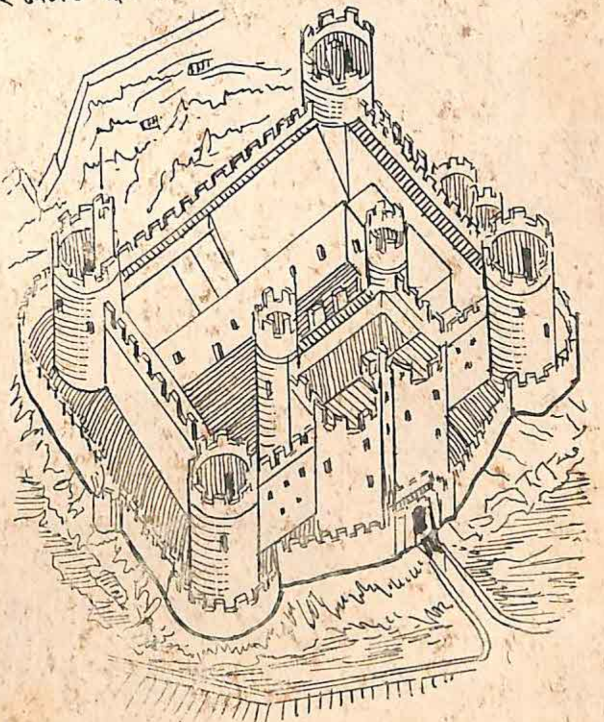
ভেঙ্গে গেল, তখন এই সমস্ত প্রচলিত প্রথা থেকে সামন্ততন্ত্রের জন্ম হল। ক্ষমতাশীল প্রভুদের আশ্রয়ে সাধারণ মানুষ পালিয়ে যেতে লাগল। স্থানে স্থানে অসংখ্য আঞ্চলিক প্রভুর উদ্ভব হল যারা উচ্চতর ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভুদের কাছ থেকে জমি ও কর থেকে রেহাই আদায় করে নিজের এলাকাভুক্ত লোকদের আশ্রয় দিতে লাগল। এইভাবে আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাড়াতে থাকলে কিছু সংখ্যক কৃষকের ভাগ্য জমির সাথে বাঁধা পড়ে গেল। এই রকম কৃষকদের কুব্জ দেহ আর নূ্যব্জ পৃষ্ঠের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে রইল সব সময় লড়াই করার জন্য প্রস্তুত একটি সমাজ, যার নাম সামন্ত সমাজ।

সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ :—সামন্ততন্ত্রের দুটি দিক ছিল—একদিকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যক্তিগত দখলদারদের অধীনে চলে যায়, আর অন্যদিকে জমিকে কেন্দ্র করে সমাজে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজার কাছে বড় প্রভুরা, বড় প্রভুদের কাছে মাঝারি প্রভুরা এবং মাঝারি প্রভুদের কাছে ছোট প্রভুরা জানাতেন আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। আর তার বদলে উর্ধ্বতনের কাছ থেকে তাঁরা পেতেন ক্ষমতা ও জমি। আনুগত্যের শপথকে বলা হত 'ওথ অফ ফিয়ালটি' (Oath of Fealty) এবং আনুগত্যদানের ফলে যে রাজ্যাংশ তাঁরা পেতেন তাকে বলা হত 'ফিয়েফ' (Fief) যাঁর কাছে আনুগত্য জানানো হত তাঁকে বলা হত 'ওভারলর্ড' এবং যিনি জানাতেন তাঁকে বলা হত 'ভ্যাসাল'। সামন্তপ্রভুদের সাধারণভাবে বলা হত লর্ড। রাজার কাছে আনুগত্য জানিয়ে বড় লর্ডরা তাঁর কাছ থেকে প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও বিচারের দায়িত্ব নিতেন এবং ছোট লর্ডদের কাছ থেকে আনুগত্য গ্রহণ করে তাঁরা আবার সেই সব ক্ষমতা ও অধিকার তাদের হাতে তুলে দিতেন। এইভাবে রাজার সার্বভৌম শাসন-ক্ষমতাকে ছোট থেকে বড় অসংখ্য সোপানে বিভক্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিজেদের দখলে নিয়ে আসতেন। এই সোপানের সবচেয়ে উপরে থাকতেন নিষ্ক্রিয় রাজা, তার নীচে কিছু বড় লর্ড বা রাজার ভ্যাসাল তাদের নীচে মাঝারি লর্ড বা বড় লর্ডদের ভ্যাসাল এবং তাদের নীচে ছোট লর্ড বা মাঝারি লর্ডদের ভ্যাসাল। সোপানের নীচের লর্ডদের সংখ্যা ছিল বেশি, উপরের লর্ডদের সংখ্যা ছিল কম। এইভাবে যে অধিকার সামন্ত প্রভুরা পেতেন তার বনিয়াদ ছিল জমি। রাজা সমস্ত জমির উপর খাস দখল রেখে মুখ্য সামন্তদের হাতে জমির ভোগদখল ছেড়ে দিতেন। মুখ্য সামন্তরা অনুরূপ ভাবে খাসদখল রেখে জমির ভোগদখল দিয়ে দিতেন সাধারণ সামন্তদের। এই ভাবে জমির দান ও গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সামন্ত সমাজের সম্পর্কগুলি স্থির হত।

সামন্ত প্রভুদের কাছে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা (Protection) চাইত। নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তাঁদের সৈন্য রাখতে হত। সৈন্য পোষণ করার জন্য দরকার হত জমি। অনাবৃষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্ত

কৃষকদের জমি সামন্ত প্রভুরা আত্মসাৎ করে নিতেন। যে কোন অজুহাতে কৃষকদের যুদ্ধে পাঠিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করেও তাদের জমি নিয়ে নেওয়া হত। জমির উপর অধিকার হারিয়ে কৃষক যখন প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করত, তখন তাদের আবার চাষ করার জন্য জমি দিয়ে দেওয়া হত। এইভাবে জমির মালিকানা হারিয়ে কৃষকরা ক্রমেই 'সার্ফ' বা স্বাধীনতাহীন কৃষকে রূপান্তরিত হত।

দুর্গ ও অশ্বারোহী বাহিনী : সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল দুর্গ এবং দুর্গই ছিল সাধারণ মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভাইকিং, মেগিয়ার, স্যারাসেন প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলির আক্রমণে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে সামন্ত প্রভুদের কাছে ছুটে যেত নিরাপত্তার সন্ধানে। আবার সামন্ত প্রভুরা যেহেতু সাধারণ মানুষকে শোষণ করে বেঁচে থাকতেন, সেইহেতু তাদের দরকার হত একটা সুরক্ষিত বাসগৃহ যেখানে তাঁরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাস করতে পারতেন। এই দুটি প্রয়োজনই মেটাত দুর্গ।



একটি দুর্গ বা ক্যাসেল

পাহাড়ের উপরে বা অন্য কোন উচ্চ স্থানে দুর্গ তৈরী করা হত। প্রথমদিকে দুর্গ হত কাঠের, পরে পাথরের দুর্গও তৈরী হতে থাকে। দুর্গের চারিদিকে থাকত একটা পরিখা এবং তার উপর থাকত লোহার শিকল দিয়ে

বাঁধা একটা সেতু যাকে ইচ্ছামত তুলে নেওয়া যেত। দুর্গের ফটক হত কাঠের তৈরী ও মজবুত।

দুর্গের মূল সেনাবাহিনী ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। একসময়ে পদাতিক বাহিনীই দেশ রক্ষা করত। কিন্তু ভাইকিং, মেগিয়ার প্রভৃতি আক্রমণকারীরা এত দ্রুত চলাফেরা করত যে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল লোহার বর্ম, শিরোস্ত্রাণে আচ্ছাদিত বর্শাধারী অশ্বারোহী বাহিনী। এই রকম



একজন অশ্বারোহী সৈনিক

বাহিনী না থাকলে সে যুগে ইউরোপে অরাজকতা নির্মূল করা সম্ভব হত না।

নাইট—যে অশ্বারোহী বীররা মধ্যযুগের অরাজকতা বিনষ্ট করেছিলেন তাঁরাই হলেন 'নাইট'। সামন্তদের কাজ ছিল যুদ্ধ করা। তাই প্রত্যেক সামন্তদের পুত্ররা ছোটবেলা থেকেই অন্য বড় সামন্তের দুর্গে বাস করে অসিচালনা, অস্ত্রক্ষেপন, শিকার, অশ্বারোহণ আত্মরক্ষার কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা করতেন। শিক্ষান্তে সেই যুবককে নাইটের পদে অভিষিক্ত করা হত। অভিষেকের আগেরদিন নাইট পদপ্রার্থী যুবক উপবাসী থেকে গির্জায় প্রার্থনা করতেন। দীক্ষার দিন দীক্ষদাতা তাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে তলোয়ারের উল্টোদিক দিয়ে তার কাঁধে মৃদু স্পর্শ করে তাকে নাইট বলে ঘোষণা করতেন। এইভাবে প্রত্যেক সামন্ত প্রভুর সাবালক পুত্র বীর ধর্মে দীক্ষিত হত। দীক্ষার পর নাইট মাঠে খেলতে যেতেন। এই খেলাকে



একজন নাইট

বলা হত 'টুরনামেন্ট' (Tournament)। কোন সময় 'টুরনামেন্ট' হত

একদিনের, কখনো কখনো তা চলত অনেকদিন ধরে। দূর-দূরান্তের নাইট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা খেলার মাঠে থাকতেন। যে যুগে নাইটদের আবির্ভাব হয়েছিল সে যুগ আজকালকার মতন বন্দুক ও গোলা বারুদের যুগ নয়। তখন লড়াই যারা করত তারা মুখোমুখী লড়াই করত। সেইজন্য নাইটদের সমস্ত শরীর বর্মে ঢাকা থাকত। তাদের বর্শার অগ্রভাগ কাঠের খাপে ঢাকা থাকত। এসব সত্ত্বেও লড়াইয়ের খেলা এত ভয়ঙ্কর হত যে নাইটরা প্রায়ই আহত হতেন। পরাজিত নাইট তার প্রতিপক্ষকে তার ঘোড়া আর অসি দিয়ে দিতেন।

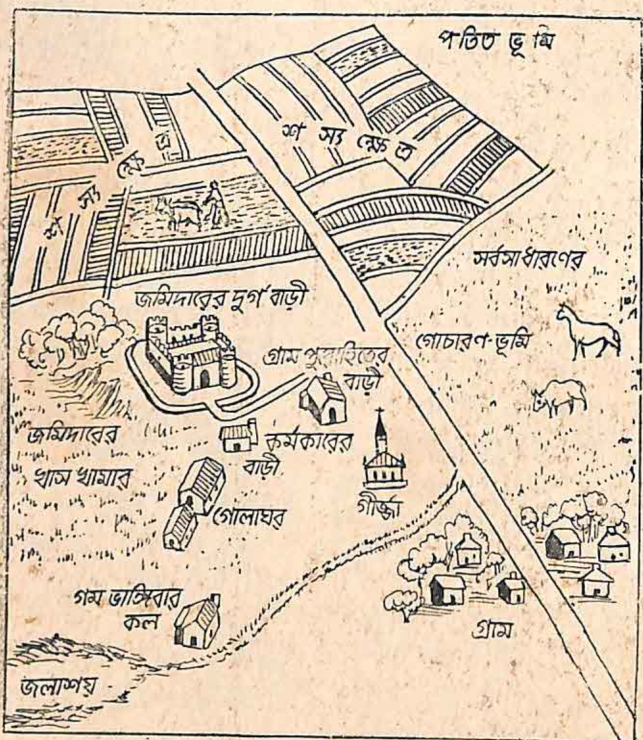
খেলার শেষে বসত ভোজসভা, সেখানে নাচ-গান হত। সবসময়ে মহিলারা উপস্থিত থেকে নাইটকে উৎসাহ দিতেন। নাইট তাঁর গুরুর গৃহে যে সৌজন্যবোধ এবং নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা শিক্ষালাভ করেছিলেন এইবার তিনি তার প্রয়োগ করতেন। এইভাবে নাইটদের জীবন শুরু হত। এরপরে নাইটরা শিকারে যেতেন, দেশভ্রমণে যেতেন, যুদ্ধে যেতেন কিংবা পিতৃগৃহে ফিরে আসতেন, ক্রুসেড আরম্ভ হবার পর বেশীরভাগ নাইট ক্রুসেডে যেতেন। তাঁরা যেখানেই যেতেন সেখানেই তাঁরা তিনটি বাণী বহন করে নিয়ে যেতেন—তাহলে ধর্ম (Religion), সম্ভ্রম (Honour) এবং সৌজন্যবোধের (Courtesy) বাণী।

শিভ্যালরি—প্রত্যেক নাইটের পক্ষে পালনীয় অভিজাত জীবনচর্যার কিছু নিয়মের নাম শিভ্যালরি। শিষ্ট ব্যবহার প্রভুর প্রতি আনুগত্য, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অনাথ ও আতুরের প্রতি দয়া, আপন প্রতিশ্রুতি-রক্ষায় তৎপরতা, সত্যপ্রীতি, ন্যায়নিষ্ঠা, অনলস কর্মশীলতা, সাহস, লড়াই করার দৃঢ়তা ইত্যাদি ছিল শিভ্যালরির নিয়ম। পেগান যুগের বীর্য ওখৃীষ্টধর্ম প্রচারিত সুকুমারবৃত্তি এই দুই মিলে গড়ে উঠেছিল শিভ্যালরির আদর্শ। এই আদর্শ যে সব সময়ে পালিত হত তা নয় তবে পরবর্তী কালের ইয়োরোপের ভদ্রজীবনের নীতি শিভ্যালরির থেকেই এসেছিল। পরবর্তী কালে নাইটরা শিভ্যালরির আদর্শ হারিয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এইরকম নাইটদের নিয়ে স্পেনের বিখ্যাত লেখক 'সারভানটেস' (Cervantes) 'ডন কুইক্‌জোট'


স্যারভ্যানটেস

নামে একটি প্রহসন লেখেন। ইতিহাসে অনেক নাইটদের গল্প শোনা যায় যাঁরা শিভ্যালরির আদর্শকে উপরে তুলে ধরেছিলেন। এরকম একজন নাইট হলেন বৃটেনদের রাজা আর্থার। তাঁর চারপাশে অনেক সাহসী ও বলিষ্ঠ নাইটদের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁরা অন্যায় অত্যাচার দমন করার জন্য প্রত্যেকদিন ঘোড়ায় চড়ে বের হতেন। এইরকম আরও অনেক নাইট ছিলেন, যেমন স্যার ল্যান্সলট, স্যার গেওয়েন, স্যার বোরস্, স্যার পেলেস, স্যার গেরেন্ট, স্যার গালাহাড ইত্যাদি। এরা যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন, শিক্ষায় উন্নত ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে মার্জিতরুচি ও সৌজন্যবোধের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। এইসব ব্যক্তিরা কিভাবে শিভ্যালরির আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা নিয়ে মধ্যযুগে অনেক গল্প ও কবিতা লেখা হয়েছিল।

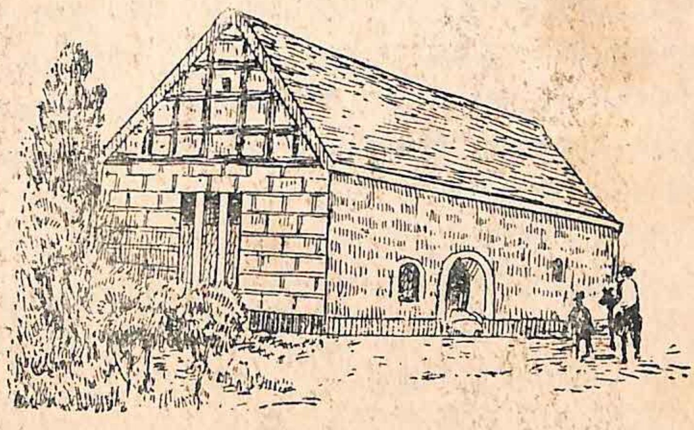
ত্রুবাতুর—মধ্যযুগে ফ্রান্সে একদল চারণ কবির আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা শিভ্যালরির বিষয় নিয়ে গান রচনা করতেন। তারা মানুষের প্রেম-ভালোবাসা নিয়েও গান লিখতেন এবং রাজসভায় গিয়ে বীণা বাজিয়ে গান



'ম্যানর হাউস বা খামার বাড়ীর নক্সা

গাইতেন। তাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় গান লিখে আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। এদের বলা হত ত্রুবাদুর।

ম্যানর—খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীর মধ্যে ইয়োরোপের সমস্ত জমি সামন্ত প্রভুদের দখলে চলে যায়। কৃষিযোগ্য বা পতিত জমি, বনভূমি এমন কি নদীগুলির উপরও সামন্ত প্রভুদের অধিকার কায়েম হয়। গ্রামাঞ্চলে সামন্তদের এই সব সম্পত্তিকে বলা হত ম্যানর। দেশের সমস্ত কৃষিকাজ ও প্রশাসন হত ম্যানরভিত্তিক। সেইজন্য সামন্তযুগে ম্যানরই ছিল একমাত্র কৃষি ও প্রশাসনিক সংগঠন। সমাজের উদ্বৃত্তভোগী যারা—যেমন, সামন্তপ্রভু, তাঁর পরিবার ও সৈন্যবাহিনী—তাদের জীবন ধারণ চলত ম্যানরের আয় থেকে। প্রত্যেক ম্যানরে লর্ড বা সামন্তের কিছু খাস জমি থাকত। তাকে বলা হত 'ডিমিন' বা 'ডোমেন'। অবশিষ্ট জমি লর্ড কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। কৃষকদের বলা হত টেনেন্ট। প্রত্যেক ম্যানর নদীর ধারে একটি সোজা রাস্তা বরাবর গড়ে উঠত। এই রাস্তার দুধারে থাকত বাড়ীঘর এবং তার সামনে বিস্তীর্ণ আবাদের জমি। তার আশপাশে থাকত কিছু খালি মাঠ এবং দূরে দূরে বনজঙ্গল। ম্যানরের জল আসত নদী থেকে, গম ও শস্য পেষাই হত লর্ডের বায়ু-চলিত কলে, লোহা বা অন্যান্য ধাতুর ছোটখাট জিনিস আসত দুয়েকটি কামারের ঘর থেকে, আর জ্বালানী কাঠ আসত দূরের বন থেকে।



'ম্যানর হাউস বা খামার বাড়ী'

ম্যানরের একটি বাজার থাকত সেখানে গ্রামের জিনিষই কেনা বেচা হত। প্রত্যেক ম্যানরে লর্ডের একটি সভা ছিল। সেখান থেকে চলত শাসন। লর্ডের হুকুমে ম্যানরের ভেতরেই অপরাধীর বিচার হত, কৃষকদের কাছ থেকে

কর আদায় করা হত এবং গ্রামের বাজার নিয়ন্ত্রিত হত। উৎপাদনের দিক থেকে প্রত্যেক ম্যানর ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ ম্যানরই ছিল সামন্ত অর্থনীতির বুনিয়াদ। প্রশাসনের দিক থেকে ম্যানর ছিল স্বশাসন-নির্ভর, অর্থাৎ লর্ডের শাসনের উপর বাইরের কোন হস্তক্ষেপ চলত না। সামরিক নিরাপত্তার দিক থেকে ম্যানরই ছিল আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার একমাত্র ভরসা কারণ প্রত্যেক ম্যানরের মধ্যে ছিল একটি করে দুর্গ। আবার সেই দুর্গের মধ্যেই ছিল ম্যানরের কৃষকদের শোষণ ও নির্যাতনের সব ব্যবস্থা। এইভাবে ম্যানরকে ঘিরেই সামন্ত যুগের জীবন আবর্তিত হত।

সামন্ত যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা: কৃষিজাত ও কর ব্যবস্থা—সামন্ত যুগ ছিল কৃষিনির্ভর। সমস্ত কৃষিকাজ হত যৌথভাবে। প্রত্যেক কৃষকের ভালোমন্দ উভয় রকম জমি থাকত এবং তা বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো থাকত। কৃষকের জমি থেকে আরেক কৃষকের জমি আল দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হত। কৃষকরা সারের কাজ জানত না বলে সব সময়ে কিছু জমি ফেলে রাখা হত যাতে সেই জমির উর্বরতা পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। বলদ দিয়ে আর কাঠের লাঙ্গল দিয়ে চাষ হত এবং পাঁচজন করে কৃষক কাস্তে দিয়ে জমি থেকে ফসল কাটত। একেইত জমিগুলি ছিল ছড়ানো, তার উপর সারের অভাবে জমি পতিত হয়ে থাকত—ফলে কৃষিকাজ মোটেই উন্নত হতে পারেনি। সকলের সম্মিলিত শ্রমে যে কৃষিকাজ হত তার ফসলের সামান্য অংশই পেত কৃষকরা. নানাবিধ করের মাধ্যমে সেই ফসলের অধিকাংশই সামন্ত প্রভুরা আত্মসাৎ করে নিত।

সামন্তযুগে কৃষকরা প্রধানত দু'রকমের কর দিত। এক রকম কর দিতে হত যাজকদের। তাকে বলা হত টিদ (Tilhes)। অনেক রকম কর দিতে হত সামন্ত প্রভুদের। কৃষকরা ছিল অধিকাংশই সার্ফ (Serf), স্বাধীনতাহীন ক্ষেতের শ্রমিক জমির সাথে যাদের ভাগ্য ছিল বাঁধা। তারা সামন্ত প্রভুকে রেন্ডার্স, বেনালিটিস, সার্ভিসেস ইত্যাদি নামে বিভিন্ন কর দিত। বিনা মজুরিতে প্রভুর জমিতেও তাদের চাষ করতে হত। একে বলা হত করভি। এছাড়া প্রভুদের নিয়মিত ডিম, মাংস, কাঠ, সব্জি ও ক্ষেতের ফসল দিতে হত। একে বলা হত মেটায়াজ। কৃষকদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও প্রভুর বাড়ীতে কাজ করত। এইভাবে সামন্ত প্রভুরা কৃষক ও তার পরিবারের লোকেদের শ্রমে,

টাকা পয়সা এবং ফসলের সিংহভাগটাই শোষণ করে নিত। কৃষকরা নিঃস্ব, নিরানন্দ হয়ে দিন কাটাত।

কৃষকরা পরিশ্রম করত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এই ভাবে সারা বছরে দশমাস তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। কিন্তু এ সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যই ছিল তাদের একমাত্র সংগী। ছোট খড়ের ছাউনি দেওয়া আলো-বাতাসহীন কুঁড়ে ঘরে তারা থাকত। খেত রুটি আর শাকশব্জী, কখনো কখনো ডিম আর মাংস। কৃষিকাজ ছাড়া কৃষকদের বনে গিয়ে কাঠ কাঠতে হত, খোলা মাঠে গবাদি পশু চরাতে হত এবং মাঝে মাঝেই প্রভুর হয়ে লড়াই করতে হত। ম্যানরের অধিকর্তা লর্ড এবং তারা যে গির্জায় উপাসনা করতে যেত সেই গির্জার যাজক, এই দুই ব্যক্তি ছিলেন কৃষকদের দন্ডমুন্ডের কর্তা। এদের জুলুমকে মানতে গিয়েই কৃষকরা সর্বস্বান্ত হত।

সামন্ত যুগের সমাজ ঃ সামন্ত যুগের সমাজে ছিল দু'ধরনের মানুষ। এক ধরনের মানুষ কোন রকম শ্রম দিত না, অন্যের শ্রমের ফসল আত্মসাৎ করে অলস ও আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করত। এরা হলেন সামন্ত প্রভু ও যাজকরা। সামন্ত প্রভু ও তার চারপাশের মানুষরা হলেন অভিজাত, বিনাশ্রমে যারা হয়েছিলেন বিপুল সম্পত্তির মালিক। সামন্তরা থাকতেন দুর্গে। ছোট ছোট ঘর, সঙ্কীর্ণ দরজা ও জানলা, আলোহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বায়ু চলাচলের অভাব, খাদ্য ও পানীয়ের সীমিত মজুত, স্বল্প আসবাব, শীতের মধ্যে ক্রমাগত কাঠ জ্বালিয়ে ঘরকে গরম রাখা এবং সর্বোপরি এক জায়গায় আটকে থাকার ফলে মানসিক নিরানন্দ—এই সবের ফলে দুর্গের জীবন মোটেই আনন্দের ছিল না। এই নিরানন্দ কাটানোর জন্য সামন্তরা মেষ, শুকর ও গরুর মাংস, সুরা ইত্যাদি বিপুল পরিমাণে ভোজন ও পান করতেন, ভাঁড়দের ব্যঙ্গকৌতুক চারণদের স্তব-স্তুতি শুনতেন, পশুপক্ষীর লড়াই দেখতেন এবং নিজেরা অসি যুদ্ধ, শিকার ও ঘোড়াদৌড় ইত্যাদি মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন।

সামন্তরা ছিলেন সমাজের 'হুজুর' শ্রেণী। তাদের বিপরীত আরেকটি শ্রেণী ছিল—'মজুর' শ্রেণী —কৃষক ও সাধারণ মানুষ। সামন্তদের জুলুম সহ্য করতে করতে এরা সামন্তদের প্রতি তিক্ত হয়ে উঠেছিল। কৃষকরা সমাজের সমস্ত শ্রম দিত বলে অলস সামন্তদের সাথে ছিল তাদের বিরোধের সম্পর্ক। সামন্তদের মত শিকার বা ঘোড়দৌড় ইত্যাদির আনন্দ তাদের ছিল না ; তারা খোলা মাঠে নাচগান করে, গ্রামের মেলায় হৈচৈ করে আনন্দ পেত।

কৃষকরা দুইভাগে বিভক্ত ছিল—স্বাধীন কৃষক এবং পরাধীন বা বন্দী

কৃষক যাদের বলা হত সার্ফ। সাধারণভাবে স্বাধীন কৃষকরা এক প্রভুর ম্যানর থেকে অন্য প্রভুর ম্যানরে চলে যেতে পারত ; কিন্তু সার্ফরা তা পারত না। তারা সপ্তাহে তিন চার দিন প্রভুর জমিতে চাষ করত। ফসল কাটার সময় সার্ফদের সপ্তাহে পাঁচ-ছয়দিন পর্যন্ত প্রভুর জমিতে শ্রম দিতে হত। রাস্তাঘাট নির্মাণ, বনজঙ্গল পরিষ্কার করা ইত্যাদি ছিল সার্ফদেরই কাজ। সার্ফদের নিজস্ব বলতে কিছুই ছিল না। তাদের প্রভু ইচ্ছা করলে তাদের জমিতে রাখতে পারতেন বা উচ্ছেদ করতে পারতেন। জমির হস্তান্তরের সাথে সাথে সার্ফরাও হস্তান্তরিত হত। তাদের পরিবারের মেয়েরা গিয়ে প্রভুর বাড়িতে সেলাই করত, রুটি তৈরী করত, গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করত। এককথায় সার্ফরা হল প্রায় প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অথচ ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত কৃষকই ছিল সার্ফ। আর এই সার্ফদের শোষণ করেই বেঁচে ছিল মুষ্টিমেয় সামন্ত অভিজাতরা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সামন্ত সমাজের সবচেয়ে বড় শ্রেণী হল কৃষক শ্রেণী। এই শ্রেণীর উপরে ছিল দুটি উদ্বৃত্তভোগী শ্রেণী—যাজক ও সামন্তরা। এই শেষের দুই শ্রেণী একদিকে যেমন রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে প্রায় সমস্ত কৃষককে সার্ফ রূপান্তরিত করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। সামন্ত প্রভু ও যাজকদের দ্বারা এই ক্ষমতা ও সম্পত্তির আত্মসাতের ঘটনাই হল সামন্ততন্ত্রের মূল কথা।

কৃষক বিদ্রোহ ঃ মধ্যযুগে এমন একটা সময় এসেছিল যখন প্রায় সমস্ত কৃষকই বংশানুক্রমিক সার্ফে পরিণত হয়েছিল। এর পাশাপাশি সামন্ত প্রভু ও যাজকদের আয় যখন কমতে থাকে তখন কৃষকদের উপর অত্যাচার বাড়তে থাকে। এই অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কৃষকরা কখনো কখনো ধর্মীয় সংগঠনে যোগ দিত। বেশির ভাগ সময় তারা শহরে পালিয়ে গিয়ে সেখানে বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পে শ্রম বিক্রয় করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করত। যারা পড়ে থাকত তাদের উপর অত্যাচার আরও বাড়তে থাকে। এই রকম অবস্থায় কৃষকরা বিদ্রোহ করল। ১৩৫৮ সালে ফ্রান্সের 'জাকারি' নামে এই রকম একটা বিদ্রোহ হয়েছিল। এর কিছু কালের মধ্যে ইংল্যান্ডে কৃষকরা ওয়াট টাইলর নামে এক সাহসী ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। ১৪১৯ সালে বোহেমিয়াতে এবং ১৫২৫ সালে জার্মানিতেও কৃষকরা বিদ্রোহ করে। ১৫৬৬ সালে নেদারল্যান্ডে যে কৃষকরা যে বিদ্রোহ করেছিল তা জাতীয় আন্দোলের রূপ নেয়। সামন্ত প্রভু ও যাজকদের বিরুদ্ধেই এই সব বিদ্রোহ গুলি পরিচালিত হয়েছিল। এই সব বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করা হয়।

সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ ছিল শোষণ এবং শোষণের ফল হয়েছিল বিদ্রোহ। মরিয়া মানুষের পাল্টা আক্রমণে যে শোষণ বন্ধ হয়েছিল তা নয়, তবে সমাজ সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এরকম সম্ভাবনা না থাকলে সমাজ বদলায় না। মধ্যযুগের সমাজও হয়ত বদলাত না।

সামন্ততন্ত্রের অবসান ঃ ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্রের ধীরে ধীরে বিকশিত হলেও একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই তার বিকাশ সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। অথচ মধ্যযুগ শেষ হবার অনেক আগেই সামন্ততন্ত্রের অবসান সূচিত হয়েছিল। নিরাপত্তার জন্য মানুষ প্রভুর কাছে নতজানু হত, কৃষকরা স্বাধীনতা বিকিয়ে জমির সাথে বাঁধা হয়ে থাকত আর শুধু নিরাপত্তা দেওয়ার বিনিময়ে প্রভুরা সবার সবকিছু শোষণ করে স্ফীত হতেন। মধ্যযুগের শেষের দিকে এমন একটা সময় এল যখন সবকিছু হারিয়ে নিরাপত্তা খোঁজার বা সবকিছু শোষণ করে নিরাপত্তা দেওয়ার কোন অবস্থাই আর রইল না। নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে সৈন্য ভাড়া করে যুদ্ধ করা যেত। তাই আর সামন্ত প্রথায় সৈন্য সংগ্রহের দরকার হত না। গোলা-বারুদ ও বন্দুকের আবিষ্কারের ফলে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে সম্মুখ সমরের প্রয়োজনীয়তা রইল না। ফলে নাইটদের উপযোগিতা কমে গেল। দেশে দেশে রাজতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে ওঠার ফলে ব্যারণ নামে সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা কমে গেল। কামান আবিষ্কার হওয়ার ফলে দূর থেকে কামানের গোলায় দুর্গ ভেঙ্গে দেওয়া যেত বলে পুরাতন প্রথায় দুর্গ আর অশ্বারোহী বাহিনীর উপযোগিতা কমে গেল। সার্ফ কৃষকরা সদ্য জেগে ওঠা নগরগুলিতে পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন শিল্পে নিজেদের শ্রম বিক্রয় করে বেঁচে থাকতে লাগল। ফলে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙ্গে গেল। সামন্ততন্ত্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙ্গে যাবার ফলে সামন্ততন্ত্রের অবসান সূচিত হল।

সংক্ষিপ্তসার—মধ্যযুগে ইয়োরোপে একসময় রাজার ক্ষমতা আঞ্চলিক প্রভুদের হাতে চলে যায়। রাজার নীচে বড় বড় প্রভু, তাদের নীচে মাঝারি প্রভু এবং তাদের নীচে ছোট ছোট প্রভু—এইভাবে একটি ক্ষমতার সোপান তৈরি হল। সবচেয়ে নীচে রইল কৃষকেরা। এই সমাজ সামন্ত সমাজ নামে পরিচিত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষকরা ছিল সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত। সামন্তপ্রভুরা নানা উপায়ে তাদের সর্বস্বান্ত করত। জমির মালিকানা হারিয়ে কৃষকরা ক্রমেই সার্ফ বা স্বাধীনতাহীন কৃষকে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল দুর্গ এবং দুর্গের মূল সেনাবাহিনী ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। অশ্বারোহী বীরদের বলা হত নাইট। প্রত্যেক নাইটের পক্ষে পালনীয় অভিজাত জীবনচর্যায় কিছু নিয়মকে শিভ্যালরি বলা হত।

সামন্তযুগ ছিল কৃষিনির্ভর। কৃষকরা চাষ করত কিন্তু তাদের শ্রমের সবটুকু ফসল

সামন্ত প্রভুদের হাতে তুলে দিতে হত। ধর্মীয় যাজক এবং সামন্ত প্রভুরা ছিল তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কৃষকরা এদের কর জোগাত।

সামন্ত যুগের সমাজে ছিল দু ধরনের মানুষ একদল শ্রম না দিয়েও বিলাসী ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করত। আরেকদল শ্রম দেওয়া সত্ত্বেও নিঃস্ব ও নিরানন্দ হয়ে দিন কাটাত। সামন্তরা ছিলেন সমাজের হুজুর শ্রেণী আর কৃষক ও সাধারণ মানুষরা ছিলেন সমাজের মজুর শ্রেণী।

কৃষকদের ওপর অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেলে কৃষকরা বিদ্রোহ করতে শুরু করে। সামন্ত প্রভু ও যাজকদের বিরুদ্ধেই এইসব বিদ্রোহগুলি পরিচালিত হয়েছিল। মরিয়া মানুষের পাল্টা আক্রমণে যে শোষণ বন্ধ হয়েছিল তা নয়, তবে সমাজ সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

অনুশীলনী

১। সামন্ততন্ত্র কাকে বলে? সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ কি?

২। মধ্যযুগে পশ্চিম ইয়োরোপকে রক্ষা করতে দুর্গ ও অশ্বারোহী বাহিনীর কি ভূমিকা ছিল?

৩। কাদের নাইট বলা হত? তাদের জীবনাদর্শ বর্ণনা কর।

৪। ম্যানর কি? ম্যানর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। সামন্ত সমাজে কয়টি শ্রেণী ছিল? সামন্ত প্রভুদের জীবন কি রকম ছিল?

৬। সার্ফ বলতে কি বোঝায়? সামন্তযুগে কৃষকদের জীবন পদ্ধতি কি রকম ছিল?

৭। সামন্তযুগে কর-ব্যবস্থা কি রকম ছিল? সংক্ষেপে সামন্তযুগের কৃষিকাজ বর্ণনা কর।

৮। সামন্তযুগের উৎপাদন ব্যবস্থায় যারা শ্রম দিত আর যারা শ্রম দিত না তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি ছিল?

৯। সামন্তযুগের কৃষক বিদ্রোহের একটি বর্ণনা দাও।

১০। টীকা লেখ:

( ) ত্রুবাদুর (খ) করভে (গ) শিভ্যালরি (ঘ) ভ্যাসাল (ঘ) লর্ড।

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। 'ওথ অফ ফিয়ালটি' কাকে বলা হত?

২। 'ভ্যাসাল' কাদের বলা হত?

। 'নাইট' কাদের বলা হত?

৪। 'ডন কুইক্জোট' এর রচয়িতা কে ছিলেন?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১। সামন্তযুগে কৃষকরা প্রধানত——কর দিত।

২। পেগান যুগের——ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত——এই দুই মিলে গড়ে উঠেছিল শিভ্যালার আদর্শ।

৩। গ্রামাঞ্চলে সামন্তদের সম্পত্তিকে বলা হত——।

৪। কৃষকদেরবলা হত——।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

[ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ; পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ক্রুসেডের প্রভাব ; বাণিজ্যে ক্রুসেডের প্রভাব ; নগরের উদ্ভব ।]

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা। খ্রীষ্টের সমাধিস্থল জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে জেরুজালেম আরবগণ দখল করে নেয়। কিন্তু খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা অবাধে যাতায়াত করতে পারত। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম এশিয়ার সেলজুক তুর্কীরা জেরুজালেম অধিকার করে। তারা খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে পোপ দ্বিতীয় আরবান ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেন। ধর্মের জন্য এই যুদ্ধ হয়েছিল বলে এই যুদ্ধের নাম ধর্মযুদ্ধ। ক্রুসেড শব্দের অর্থ ক্রুশ চিহ্নিত। ল্যাটিন ক্রাক্স (crux) কথার অর্থ ক্রশ বা ক্রুশ। ধর্মযোদ্ধাগণ তাঁদের পতাকা এবং পোষাকে ক্রুশ চিহ্নিত করতেন বলে এই যুদ্ধকে ক্রুসেড বলা হয়। এই যুদ্ধ চলেছিল প্রায় দুশ বছর।



ক্রুসেডে অংশ গ্রহণকারী নাইট

ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ঃ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল। পোপ চেয়েছিলেন এক আন্তর্জাতিক ধর্মীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে। সামন্ত প্রভু ও নাইটরা চেয়েছিলেন প্রাচ্যের সম্পদ লুঠ করে নিজেদের দারিদ্র মোচন করতে। পোপই সামন্ত প্রভুদের বুঝিয়েছিলেন যে প্রাচ্যে গেলে তারা পাবে আরো বিত্ত, আরো ক্রীতদাস, আরো সার্ফ ও আরো জমি। এই ঐশ্বর্যের লোভে দস্যু তস্করাও ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিল। বণিকরা চেয়েছিল বাণিজ্যের নিরাপত্তা, আরবদের জুলুম থেকে অব্যহতি এবং বাণিজ্যের আরো বাজার। অত্যাচারিত কৃষকরা চেয়েছিল সামন্ত

শোষণ থেকে নিষ্কৃতি। তারা জানত যে দূরে পালিয়ে গিয়ে তারা সামন্ত প্রভুদের চাবুক থেকে বাঁচতে পারবে। সৈন্যরা ভাগ্যান্বেষণের তাগিদে ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিল। পুণ্যবানরা চেয়েছিল যথার্থভাবে পুণ্য করতে। ক্রুসেডে যোগদানকারী সমস্ত মানুষকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি শহরের বণিকরা। ক্রুসেডের সাথে তাদের ভাগ্য গভীরভাবে জড়িত ছিল। ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, জীবিকা ও মুক্তি—এই পঞ্চ স্বার্থের তাগিদে ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল।

ক্রুসেডের কাল ও ঘটনা—প্রথমে ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল ১০৯৬ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই ক্রুসেডে দুজন ব্যক্তি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। একজনের নাম ওয়ালটার দ্য পেনিলেস, আরেক জনের নাম পিটার দ্য হারমিট। ওয়ালটারের নেতৃত্বে যে দলটি ক্রুসেডে গিয়েছিল তারা কনস্টান্টিনোপলে পেঁছিতে পেরেছিল। পিটার ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। তাঁর দলটি হয় মাঝপথে মারা যায়, নয়ত বার্গান্ডি অঞ্চলে তাদের বন্দী করে ক্রীতদাস রূপে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ক্রুসেডটি আরম্ভ হয়েছিল ১১৪৭ সালে চলেছিল ১১৪৯ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রথম ক্রুসেডের প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে দ্বিতীয় ক্রুসেড আরম্ভ হয়েছিল। এই ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফ্রান্সের রাজা লুইস এবং জার্মানির সম্রাট তৃতীয় কনরাড। যেহেতু ইয়োরোপের সবচেয়ে শক্তিমান দুই রাজা ক্রুসেডে গিয়েছিলেন সেইহেতু সমকালীন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ সেন্যবাহিনীকে ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ক্রুসেডে খ্রীষ্টানরা কিছুই করতে পারেনি। এই ক্রুসেডের ফলাফলে দেখা গেল মুসলমানরা অনেক শক্তিশালী। ইয়োরোপের নাইটদের দক্ষ যোদ্ধারূপে যে সুনাম ছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম আবার মুসলমানদের হাতে পতিত হয়। তখন আবার ক্রুসেডের আয়োজন করা হল। ঐটি হল তৃতীয় ক্রুসেড। এই ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা। তারপরে ইংলন্ডে রাজা রিচার্ড দ্য লায়ন-হার্টেড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্টাস বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ক্রুসেড যাত্রা করেন। মুসলমান শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সমগ্র ইয়োরোপ থেকে এক বড় প্রচেষ্টা আগে বা পরে আর কখনো হয়নি। এই ক্রুসেডে জার্মানির রাজা জলে ডুবে যান। ফ্রান্স ও ইংলন্ডের রাজারা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেননি। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চতুর্থ ক্রুসেড সংঘটিত হয়। অন্য ক্রুসেডগুলির তুলনায়

এই ক্রুসেড ছিল নিতান্ত নগন্য। এই ক্রুসেডেই ইয়োরোপের খ্রীষ্টান সৈন্যরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে সেখানকার মানুষদের উপর এমন অত্যাচার চালায় ইতিহাসে যার উদাহরণ নিতান্তভাবে বিরল।

পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেডের প্রভাব—ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। রাজা-প্রজা, প্রভু-ভৃত্য, সামন্ত প্রভু, সার্ফ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, সাধু ভিক্ষুক দলে দলে প্রাচ্যে এসেছিল। সমাজের এই সর্বস্তরের নড়াচড়ায় দেখা দিয়েছিল এক পরিবর্তন। ধর্ম যুদ্ধে শক্তিক্ষয় করে ইয়োরোপের সামন্তশ্রেণী ক্রমশ দুর্বল পড়ে। এই সুযোগ নিয়ে একদিকে রাজা অন্যদিকে সাধারণ লোক ও নগরবাসী ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন শিথিল হওয়ার দরুণ শহরের সাধারণ মানুষের মুক্তি ত্বরান্বিত হয়েছিল। সামন্তপ্রভুরা অর্থাভাবে শহরের লোক, গ্রামের কৃষক ও সার্ফদের কাছে নিজেদের প্রাপ্ত সুবিধাগুলির বিক্রয় করে দিতেন।

প্রাচ্যের সঙ্গে ইয়োরোপের এই সংযোগের ফলে পাশ্চাত্যে অনেক নতুন শস্য এবং ফলের আমদানি হতে থাকে। খেজুর, তরমুজ, লেবু প্রভৃতি ফলের সঙ্গে ইয়োরোপ পরিচিত হয়। পাশ্চাত্যের লোকেরা দৈনন্দিন জীবনে শিখেছিল অনেক নতুন জিনিসের ব্যবহার, যেমন, প্রসাধন দ্রব্য, মশলা, মিষ্টান্ন, চিনি, কাঁচের বাসন, কার্পাস, মিহি সুতা, মসলিম (কাপড়), আয়না, গন্ধ দ্রব্য, আতর, বিলাসী পোষাক, গোলাপ নির্যাস, তরল দ্রব্য ও মাদক ইত্যাদি। কিছু দুরারোগ্য ব্যাধিকেও তারা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলো তাদের দেশে। ভোজনের পূর্বে যে হাত ধুয়ে নিতে হয় তারা শিখেছিল প্রাচ্যদেশে।

বাণিজ্যে ক্রুসেডের প্রভাব—ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠা ধর্মযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। বাণিজ্যে প্রধান ভূমিকা ছিল উত্তর ইটালীর শহরগুলির। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধে বাইজানটিয়াম বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ভেনিস এবং জেনেয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে পেরে উঠল না। সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের বন্দরগুলিতে ভেনিস এবং জেনোয়ার বণিকদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। ইয়োরোপে গড়ে উঠল এক ব্যাংক ব্যবস্থা। স্বর্ণমুদ্রা চালু হল এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠল। গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন নগর। বাণিজ্যের সুবিধা বাড়তে অনেকেই বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকেছিল। কৃষি থেকে কুটিরশিল্প বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ইয়োরোপীয়গণের ভৌগোলিক জ্ঞান বেড়ে যায় এবং নতুন দেশ, ধর্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে তারা জানতে পারে। প্রাচ্যের উপাখ্যান পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার ধারাকে বদলে দিয়েছিল। ভূমির বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার ফলে অনেক কৃষকই কারিগরের

জীবন গ্রহণ করেছিল। এমনি করে সমাজব্যাপী ঘটেছিল এক পরিবর্তন যার মূল কারণ ছিল ক্রুসেড। কিন্তু ক্রুসেডের মূল উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ জেরুজালেম অধিকার করা—ইয়োরোপীয়ানরা সফল করতে পারেনি। পবিত্রস্থান জেরুজালেম মুসলমানদের হাতেই রয়ে যায়।

নগরের উদ্ভব—ক্রুসেডের ফলে ইয়োরোপের সমাজবন্ধন যত শিথিল হচ্ছিল ততই সার্ফ ও সাধারণ কৃষক এবং কারিগররা শহরে পালিয়ে গিয়ে নূতন জীবিকার চেষ্টা করতে শুরু করল। আবার শহরে থাকত বণিকরা যারা ক্রুসেডের ফলে প্রাধান্য পেয়েছিল। এর ফলে ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন শহর গড়ে উঠতে লাগল। কারিগররা যতই কৃষির জগত থেকে সরে আসতে লাগল ততই কৃষির সাথে কুটীর শিল্পের যোগও ছিন্ন হতে লাগল। শহরের আকর্ষণে এবং নূতন বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভারের চাহিদা মেটাতে কারিগররা যেমন কৃষির থেকে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল সেইরকম কৃষির থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কারিগর ও শহরে পালিয়ে আসা কৃষি শ্রমিকদের চাপেও শহর বাড়তে লাগল। কৃষির থেকে কুটির শিল্পের বিচ্ছিন্নতা ও শহরের উদ্ভব—এই দুটি মধ্যযুগের দুটি সম্পূরক ঘটনা।

সংক্ষিপ্তসার—খ্রীষ্টের সমাধিস্থল জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার নাম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। এই ধর্মযুদ্ধের আহবায়ক ছিলেন পোপ দ্বিতীয় আরবান। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের তাগিদে এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে সামন্ত প্রভুরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়েছিল রাজ্যের সাধারণ লোক ও নগরবাসীদের। প্রাচ্যের সঙ্গে ইয়োরোপের সংযোগ ঘটেছিল। ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠা ধর্মযুদ্ধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফল।

অনুশীলনী

১। ক্রুসেড কেন সংঘটিত হয়েছিল? সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেডের কি প্রভাব দেখা গিয়েছিল?

২। বাণিজ্যের উপর ক্রুসেডের কি প্রভাব দেখা গিয়েছিল?

৩। ক্রুসেড নগরের উদ্ভবকে কিভাবে সাহায্য করেছিল?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। ক্রুসেড শব্দের অর্থ কি?

২। ক্রুসেডে সামন্ত প্রভুদের কি উদ্দেশ্য ছিল?

৩। ক্রুসেডে মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১। ল্যাটিন ক্রাক্স কথার অর্থ——বা——।

২। ভূমির বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার ফলে অনেক কৃষকই——জীবন গ্রহণ করেছিল।

৩। ——শতাব্দীতে জেরুজালেম আরবগণ দখল করে নেয়।

মধ্যযুগের নগর ও নাগরিক

[মধ্যযুগে নগরের উদ্ভব ; নগর উদ্ভবের কারণ ; নগর উদ্ভবে ক্রুসেডের অবদান, বণিক সংঘ বা গিল্ড ; গিল্ডের কাজ ; গিল্ডের সদস্য ; মধ্যযুগে নগর জীবন ; বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব ; নগরের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা।]

মধ্যযুগে নগরের উদ্ভব—নগরের উত্থান মধ্যযুগের একটি অন্যতম প্রধান ঘটনা। নগরগুলির উদ্ভব হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ১০০০ সাল থেকে ১২০০ সালের মধ্যে। এই নগরগুলির মধ্যে ইটালীর ভেনিস, জেনোয়া, বেলোনা, পিসা, ফ্লোরেন্স ইত্যাদি, ফ্রান্সে প্যারিস, অরলিন্স, বোরদঁ, জার্মানীতে হামবুর্গ, কলোন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মিউনিক, ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ, রাশিয়াতে মস্কো, কিয়েভ এবং মধ্য ইউরোপের ভিয়েনা উল্লেখযোগ্য।

নগর উদ্ভবের কারণ—কতকগুলো কারণে ইয়োরোপে নগরের উদ্ভব হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার ছ'শ বছরের মধ্যে ইয়োরোপে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছিল। ফলে বসতি হয়েছিল ঘন। কর্মের চাহিদা গিয়েছিল বেড়ে। কৃষির সাথে শিল্পের যোগও মধ্যযুগের শেষের দিকে বিছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। গ্রাম্যজীবনে ঘটেছিল এক রূপান্তর। উদ্ভব হল নগরের। কোন কোন স্থানে মঠের চারপাশে কতকগুলো বসতি গড়ে উঠেছিল। এগুলো থেকেই জন্ম নেয় সেন্ট এডমান্ডস, সেন্ট আলবান ইত্যাদি নামের নগরগুলি।

নগর উদ্ভবে ক্রুসেডের অবদান—ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ইয়োরোপের সমাজ জীবনে এনেছিল এক ব্যাপক পরিবর্তন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগ বাণিজ্যে এনেছিল সমৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে বেড়েছিল রাস্তাঘাট আর বেড়েছিল বণিককুলের প্রাধান্য। প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে দিয়েছিল নূতন জিনিসের স্বাদ। নূতন জিনিসের চাহিদার সংগে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছিল নূতন নূতন শিল্প। সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন শিথিল হওয়াতে সার্ফরা মুক্ত হচ্ছিল। অনেকেই শহরে গিয়ে কারিগরের কাজ নিচ্ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার সংগে বেড়েছিল জাহাজ-নির্মাণ শিল্প। এই শিল্পকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছিল কতকগুলো নগর। ক্রুসেডের দান হিসাবে ইটালীর ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি শহরগুলিকে ধরা যেতে পারে।

বণিক সংঘ বা গিল্ড - নগরের কারিগররা নগর উদ্ভবের কিছুকালের

মধ্যেই গোষ্ঠীবদ্ধ হতে থাকে। এগুলিকে বলা হয় গিল্ড। বণিকদের সংঘকেও গিল্ড বলা হত। এই গোষ্ঠীবদ্ধতা কিছু নূতন নয়। রোমান সাম্রাজ্যে কলেজিয়া আর্টস (collegia artes) নামে একধরণের সমবায় ছিল। বর্বর আক্রমণের পরে সেগুলি আর টিকে থাকে নি। প্রাচীন কালের সমবায়গুলি মধ্যযুগের বণিক ও কারিগরদের গিল্ডের মত এত সংঘবদ্ধ ছিল না।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের কারিগররা অন্য দেশের কারিগরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানোর জন্য নিজেদের সুসংবদ্ধ করে করে তোলে। নিজেদের জীবিকার ধারাবাহিকতা রক্ষাই ছিল তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য। বণিক সংঘের সভ্য ভিন্ন অন্য কেউ নগরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত না। শ্রমিকরা কি ধরণের জিনিস তৈরি করবে তা নির্ধারণ করত গিল্ড। কে কত মজুরি পাবে, কোন জিনিসের কি দাম হবে, নগরে কত আমদানী ও কত রপ্তানী হবে এগুলো ঠিক করাও ছিল গিল্ডের কাজ। নগর কর্তৃপক্ষগণ গিল্ডগুলিকে সমর্থন করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে পণ্য-সম্ভারের মান বজায় রাখার জন্য এই সংগঠন গুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ক্রমেই গিল্ডের সংখ্যা বাড়তে লাগল। তাঁতী, মুচি রুটির কারিগর, দরজী, ছুতার ইত্যাদি শ্রমশিল্পীরা গিল্ডের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ হতে লাগল। লন্ডন ও প্যারিস নগরে প্রায় একশ গিল্ড বা কারিগরদের সংঘ ছিল।

গিল্ডের কাজ—শিল্প এবং ব্যবসার স্বার্থ দেখাই ছিল গিল্ডের প্রধান কাজ। গিল্ড একদিকে বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে কারিগরদের রক্ষা করত, অন্যদিকে তাদের প্রতি নগরের ভেতরে যেন কোন অত্যাচার না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখত। মূল্যনির্ধারণে তারা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত বলে কারিগররা অসৎ উপায়ে মুনাফা করতে পারত না। এতে ক্রেতার সুবিধা হত। ছোট ছোট কারখানা ছিল প্রত্যেক গিল্ডের অধীনে। প্রত্যেক কারিগরই ছিল কোন না কোন গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত। একক ভাবে কেউই নিজের প্রচার চালাতে পারত না বা কোন পণ্যদ্রব্য তার নিজের তৈরি বলে দাবি করতে পারত না। সব কিছুই হত গিল্ড বা সংঘের মাধ্যমে। কারিগদের উপর 'টাউন কাউন্সিল' বা নগর প্রশাসনের কর্তৃত্ব কবুল ছিল। ক্রমে এই গিল্ডগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের জীবিকা বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার দাবি করতে থাকে। কিছু পরে নগর প্রশাসনের ব্যাপারে তারা বণিকদের সমকক্ষ বলে দাবি করলে গোলমালের সূত্রপাত হয়।

কারিগরদের স্বার্থে গিল্ড আরেকটি কাজ করত। দুস্থ সদস্যদের তারা

সাহায্য করত। অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল গির্জা নির্মাণ, জাঁকজমকের সাথে ধর্ম-উৎসব-পালন, নাট্যাভিনয় ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা। শিক্ষার প্রসারেও ছিল গিল্ডর অবদান। সমাজসেবা, ব্যাঙ্ক, বীমা, ঋণদান ইত্যাদি কার্যাবলীও গিল্ড সম্পন্ন করত। গিল্ডের মাধ্যমে পথঘাট নির্মাণ, ঘরবাড়ী তৈরী ইত্যাদি নগর-উন্নয়নের কাজ হত। এককথায় একটি অর্থ-নৈতিক সামাজিক সংগঠন ছিল এই গিল্ড।

গিল্ডর সদস্য—গিল্ডে তিন ধরনের সদস্য ছিল। 'মাস্টার' বা কারখানার মালিক, এপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবীশ বা জার্নিম্যান বা বেতনভুক কর্মচারী। এই তিন শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা ঠিক করে দিত নগর প্রশাসন। শ্রমিকদের সংখ্যা ঠিক করে দিত নগর প্রশাসন। শ্রমিকদের সংখ্যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। জার্নিম্যান সপ্তাহান্তে তার মজুরী পেত এবং দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাত। এপ্রেন্টিসদের আর্থিক অবস্থাও খুব ভালো ছিল না। অনেকসময়েই এই দুই শ্রেণীকে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে দেখা যেত।

মধ্যযুগে নগর জীবন—মধ্যযুগে নগরগুলি ছিল নোংরা আর অস্বাস্থ্যকর। দূরে নগরগুলির পরিখা প্রাচীর, তোরণ ও অট্টালিকা দেখলে সেগুলিকে ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যপূর্ণ বলে মনে হত। কিন্তু শহরের ভেতর ছিল একেবারে বিপরীত। পথের ধারে বড় বড় বাড়ী থাকার দরুণ পথগুলো থাকত অন্ধকার হয়ে। রাস্তায় রাস্তায় শুয়োর এবং কুকুর ঘুরে বেড়াত। বাড়ীর আবর্জনা রাস্তায় ফেলা হত। জলাশয় এবং কূপগুলি ছিল প্রায়ই দূষিত। রোগ ও মহামারী লেগেই থাকত।

শহরে সকল প্রকার মানুষের কাজ ভাগ করা ছিল। টাউন কাউন্সিল বা নগর সভা এই কাজগুলির তদারক করতেন। কাছাকাছি গ্রাম থেকে কৃষক এবং ছোট ব্যবসায়ীরা শহরে বিক্রি করতে আনত মাছ-মাংস, শাক সব্জি ও অন্যান্য ফসল। শহরের সাধারণ মানুষ এ সবের ওপরই নির্ভর করত। শহরের কাজ চলত কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে। শহরবাসীদের জীবন মাঝে মাঝেই একঘেঁয়ে হয়ে উঠত। শহরে একটি বা দুটি গির্জা থাকত। এই গির্জা বা 'ক্যাথেড্রাল' ছিল সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি। বাজার বা মেলা বসবার জন্য প্রত্যেক শহরে একটু করে খোলা জায়গা থাকত। রাস্তার পাশে ছিল সরাইখানা। বাজারের সামনে ছিল 'টাউন হল'। তাতে একটা বড় ঘড়ি লাগানো থাকত। বড়লোকদের বাড়ী পাথরের এবং গরীবদের কাঠের বাড়ী ছিল। গরীবরা সাধারণ পোষাক পরত এবং কোন অলঙ্কার ব্যবহার করার সামর্থ তাদের ছিল না। ধনীশ্রেণী পরত জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক এবং তাদের স্ত্রীরা মূল্যবান পাথরসজ্জিত অলঙ্কার পরত। রাত্রে রাস্তায় কোন

আলোর ব্যবস্থা না থাকাতে দস্যু ও তস্করের উপদ্রব্য বেড়েই চলেছিল। শুধু দু' এক জন পাহারাদার একটা লম্বা লাঠির ডগায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে টহল দিত।

বুর্জোয়াজির উদ্ভব—মধ্যযুগের গ্রামে যেমন ছিল সামন্ত প্রভু এবং সার্ফ, শহরে তেমনি ছিল দুটো শ্রেণী বুর্জোয়াজি ও কারিগর-শ্রমিক। 'বারজিস' (Burgess) কথা থেকে বুর্জোয়া (Bourgeoisie) কথাটি এসেছে। 'বারজিস' ছিল শহরের বণিক-শ্রেণী। তারাই শহরের কর্তৃত্ব করত এবং প্রশাসন চালাত। আরও পরে বণিক, পুঁজিপতি কলকারখানার মালিক, ব্যাঙ্কের অধিপতিদেরও বুর্জোয়াজি বলা হত। এরা গিল্ডগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। শহরের মাঝখানে এদের জন্য ছিল টাউনহল, ছিল নাট্যশালা এবং প্রমোদাগার। 'থিয়েট্রাম' বা নাট্যশালায় তারা মাঝে মাঝে নাটক করত আর টাউন হলে সম্মিলতভাবে ভোজন করত।

নগরের স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা—নগর উদ্ভবের প্রথম দিকে গ্রামের মত নগরের উপরেও সামন্তপ্রভুর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার ছিল। নগরবাসীদের অবস্থা ছিল খানিকটা গ্রামের সার্ফদের মত। তাদের কোন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না। ব্যবসা-বানিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি ধনী ও স্বাধীনচেতা বণিক সম্প্রদায় গড়ে উঠতে থাকে। এরা রাজকীয় শাসন এবং সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। কখনও নগদ টাকা দিয়ে, কখনও বা বার্ষিক করদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার কখনওবা ঐক্যবদ্ধভাবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে নগরগুলি সামন্ত-প্রভুদের হাত থেকে ক্ষমতা আদায় করতে চেষ্টা করে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নিরন্তর সংগ্রাম করে তারা তাদের স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থের বিনিময়ে সামন্তপ্রভুরা তাদের ক্ষমতা নগরবাসীদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হতেন। নগরবাসীদের দাবি স্বীকার করে তারা একটি সনন্দ পত্র দিতেন। অর্থ এবং বিত্ত ছাড়াও নগরবাসীরা আয়ত্ত করেছিল এক ঐকবোধ্য ও দৃঢ়তা। লীগ অফ ভেরোনা, লম্বার্ড লীগ ইত্যাদি নামে নগরগুলি জোট বেঁধেছিল। জোট বেঁধে তারা নিজেদের শাসনের ক্ষমতা, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, একবছর শহরে বসবাসকারী সার্ফদের স্বাধীনতা, কর গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি আদায় ক'র নেয়।

স্বায়ত্ত-শাসনেগ সনন্দ লাভ করার পর প্রথমে নগরের শাসন ক্ষমতা ছিল একজন মে র ও কয়েকজন অল্ডারম্যান বা সদস্যের হাতে। এদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি পৌরসভা। পৌরসভার সদস্যদের নগরবাসীরা নির্বাচিত করত। সকলে সমান অধিকার ভোগ করত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শাসনক্ষমতা ক্ষুদ্র একটি ধনী বণিক সম্প্রদায়র হাতে চলে যায়। নগরগুলির

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে সাধারণ মানুষ এবং দরিদ্রের অবশ্য কোন লাভ হয়নি। শেষের দিকে নগরগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই আরম্ভ করে। ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজতন্ত্র তার ক্ষমতাগুলো আবার ফিরে পেয়েছিল।

সংক্ষিপ্তসার :—খ্রীষ্টীয় ১০০০ সাল থেকে ১২০০ সালের মধ্যে ইয়োরোপে কতকগুলি নগরের উদ্ভব হয়েছিল। জনসংখ্যাবৃদ্ধি নগর উদ্ভবের অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধও নগর উদ্ভবের আরেকটি কারণ। নগরে ছিল গিল্ড বা বণিক সংঘ। শিল্প এবং ব্যবসার স্বার্থ দেখাই ছিল গিল্ডের প্রধান কাজ। এই নগরগুলিতে দুটি শ্রেণী ছিল, বুর্জোয়া ও কারিগর বা শ্রমিক। নগরগুলি ধীরে ধীরে সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে থাকে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নিরন্তর সংগ্রাম করে তারা তাদের স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ এবং দরিদ্রের কোন লাভ হয়নি। শেষের দিকে নগরগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই আরম্ভ করে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রাজতন্ত্র আবার তার ক্ষমতাগুলো ফিরে পায়।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগে ইয়োরোপে নগরগুলির উদ্ভবের পিছনে ক্রুসেডের কি কি অবদান ছিল ?

২। গিল্ড কি ? গিল্ডের কি কাজ ছিল ?

৩। বুর্জোয়া কারা ? তারা কি রকম জীবন যাপন করত ?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। গিল্ডএ কয় প্রকার সদস্য ছিল ?

২। শহরের সবচেয়ে সুন্দর বাড়া কোনটা ছিল ?

৩। 'থিয়েট্রাম' কাকে বলত ?

৪। নগরের শাসনক্ষমতা কাদের হাতে ছিল ?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১ রোমান সাম্রাজ্যে—————নামে এক ধরনের সমবায় ছিল।

২। লণ্ডন ও প্যারিস নগরে প্রায় ——সংঘ ছিল।

৩। টাউন হলে একটা বড় ——লাগানো থাকত।

৪। 'বারজিস' কথা থেকে ——কথাট এসেছে।

৫। পৌরসভার সদস্যদের——নির্বাচিত করত।

মধ্যযুগের সুদূর প্রাচ্য

(ক) চীন : সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

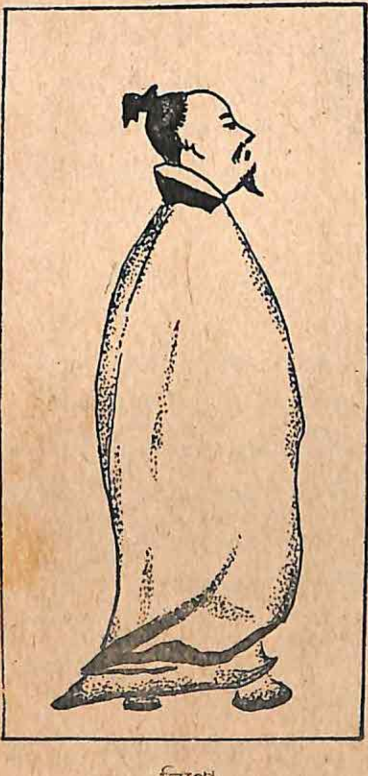
[তাং বংশ (৬১৮-৯০৭) ; তাং যুগের সংস্কৃতি ; বৌদ্ধধর্ম ; হিউ-এন সাঙের ভারত ভ্রমণ ; প্রতিবেশী রাজ্যে চীনের প্রভাব ; সুং যুগ ; সুং যুগের সংস্কৃতি ; ইউয়ান যুগ ; মার্কো পোলো]

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যতাগুলির একটি হল চীনের সভ্যতা। প্রাচীনকালে চীনে চৌ নামে এক রাজবংশের রাজত্বকালে অখণ্ড চীন সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে চীনের ঐক্য ভাঙতে থাকে। রোম সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর যেমন ইয়োরোপে গুপ্তসাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর যেমন ভারতবর্ষে, চীনেও ঠিক তেমনি চীন সাম্রাজ্যের ঐক্য ভাঙার সাথে সাথে মধ্যযুগের সূচনা হয়।

তাং বংশ (৬১৮-৯০৭)—তাং বংশের রাজত্বকালে চীনে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল এবং চীনা ঐক্য আবার ফিরে এসেছিল। তাং বংশের প্রথম রাজা ছিলেন কাও সু। তাঁর পুত্র তাই সুং ছিলেন তাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তাই সুং-এর সময় চীন সাম্রাজ্য পারস্য ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি তাতারদেরও পরাজিত করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুয়াং সু-এর রাজত্বকালে তাং বংশ গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। এই সময় তুর্কী ও তীব্বতীরা পরাজিত হয় এবং মঙ্গোলিয়াওতুর্কীস্থানের এক বিরাট অংশ চীনাদের অধিকারে আসে। পূর্বে ও পশ্চিমে সাম্রাজ্য জয়ের সাথে সাথে তাং রাজারা দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে রাজসভায় নানাবিধ ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ করেছিলেন। তার ফলে চীনের ঐক্য সংহত হয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

তাং যুগে কনফুসিয়াসের দর্শনের ভিত্তিতে চীনের আইনগুলিকে সংস্কার করা হয়েছিল। এই আইনগুলির লক্ষ্য ছিল অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া, কোন বৃহত্তর সামাজিক আদর্শে নয়। মানুষের জীবন, সম্পত্তি, সামাজিক

ইত্যাদি সম্বন্ধে চীনের প্রচলিত প্রথা যা ছিল তাকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাং রাজাদের লক্ষ্য। দেশের ঐক্য ফিরিয়ে আনাই যেহেতু তাং রাজাদের লক্ষ্য ছিল সেইহেতু তাঁদের আইন ছিল কঠোর। জোরালোভাবে সেই আইন বলবৎ হয়েছিল। এই সময় চীনের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে আইন একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয় ছিল। চীনের প্রথা ভিত্তিক সনাতন আইনকে বলা হত লি (Li)। এছাড়া ছিল সম্রাটের নির্দেশ (Statute)। লিকে পটভূমিকায় রেখে সম্রাটের হুকুম জারি হত। তাং রাজারা তাঁদের সাম্রাজ্যকে দশটি 'তাও' বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক 'তাও'-কে একটি সামরিক শাসনকর্তার অধীনে রাখা হত। সম্রাট নিজে রাজধানী থেকে শাসন পরিচালনা করতেন। সম্রাটকে সাহায্য করত একটা বড় আমলাতন্ত্র। একটি কঠিন পরীক্ষায় পাশ করে আমলাতন্ত্রের লোকজন প্রশাসনে চাকুরী পেত। আমলাতন্ত্রের লোকজন রাজধানীর কেন্দ্রীয় শাসনে যেমন ছিলেন, ঠিক তেমন ছিলেন রাজধানীর বাইরে প্রাদেশিক প্রশাসনে। আমলাতন্ত্রের লোকেরাই লি এবং সম্রাটের হুকুমকে দেশে বলবৎ করতেন।



লিপো

তাং যুগের সংস্কৃতি— তাং যুগের শিক্ষার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছিল। প্রশাসকের চাকুরীই ছিল সে যুগের আকর্ষণীয় জীবিকা। প্রশাসক হবার জন্য পরীক্ষায় পাশ করতে হত এবং তার জন্য রাজধানীতে ও বিভিন্ন প্রদেশে অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও কনফুসিয়াসের মতবাদও এই শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করেছিল। তাং যুগে চীনের কাব্য অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই কবি ছিলেন

লি পো (Li Po) এবং তু ফু (Tu Fu)। লি পো ছিলেন গরিব ও ভবঘুরে। তিনি শহর ও যেমন ভালোবাসতেন সেইরকম ভালোবাসতেন নদী, বনজঙ্গল ও গ্রামাঞ্চলের প্রকৃতি। তিনি অসংখ্য গীতি-ধর্মী কবিতা লিখেছেন। তু ফুও ছিলেন গরিব। বাস্তব জীবনের দুঃখ কষ্ট নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতা লি পোর কবিতার মত গীতিধর্মী নয়। সম্রাটের দরবার থেকে দরিদ্রের কুঁড়ে ঘর পর্যন্ত লি পোর যাতায়াত ছিল। তাঁর মত অভিজ্ঞতা তু ফু'র ছিল না। লি পো ও তু ফু দুজনেই ছিলেন ব্যর্থ জীবনের কবি।



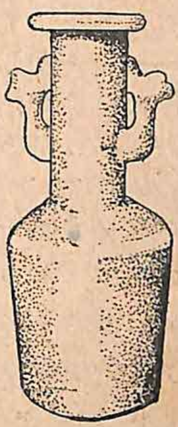
কবি তু ফু

তাং যুগে চীনে অঙ্কন শিল্পেরও উন্নতি হয়েছিল। গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পের প্রভাবে চীনে অঙ্কন শিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। চীনের চাঙ্গান লোয়াং প্রভৃতি শহরের বুদ্ধমন্দিরগুলির দেয়ালে অসাধারণ চিত্রশিল্প অঙ্কিত আছে। এ যুগের একজন বড় শিল্পী ছিলেন উ তাও-সুয়ান। তিনি আঁকতেন প্রকৃতির দৃশ্য। আরেক জন বড় শিল্পী হলেন হান কান। তাঁর ছবির প্রধান বিষয় ছিল ঘোড়া। বৌদ্ধ দর্শন ও তাও মতবাদ চীনের অঙ্কন শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঐতিহাসিকরা বলেন যে তাং যুগ হল অঙ্কন শিল্পে চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। অতীত শিল্প চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই অঙ্কন শিল্প উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। তাছাড়া চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে যে সব বিদেশীরা বাস করত তাদের প্রভাবও এই সময়ে চীনের অঙ্কন শিল্পের মধ্যে দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে তাং রাজত্বে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুদ্রণশিল্প গড়ে ওঠে। কাঠের ফলকে হরফ চিহ্নিত করে তা দিয়ে মুদ্রণ করা হত। এইভাবে

কাঠের হরফে বৌদ্ধ সূত্রগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় চীনে মুদ্রণশিল্প গড়ে উঠেছিল।

তাং যুগে আরেকটি বড় ঘটনা হল চা পানের প্রসার। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে চীনদেশে চা পানের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমে দক্ষিণ চীনের লোকেরা চা পান করত। কিন্তু তাং যুগে পানীয়রূপে সমস্ত মানুষের কাছে সমাদর লাভ করে। অষ্টম শতাব্দীতে গরিবরাও চা-কে পানীয় রূপে গ্রহণ করে এবং চায়ের উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে।


তাং যুগে চীনা-মাটির পাত্র

তাং যুগের বেশির ভাগ লোক কৃষিকাজ করে জীবিকা অর্জন করত। খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা করে, গরিব কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে, কর ব্যবস্থাকে সরল করে কৃষিকাজকে উৎসাহ দেওয়া হত। কৃষকদের অধীনে ছিল ছোট ছোট জমি এবং তারাই ছিল এই জমির মালিক। অনেক সময় সৈন্যরাও কৃষিকাজে লিপ্ত হত। কৃষির সাথে চীনে বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। এই সময় ক্যাণ্টন ছিল চীনের একটি বড় বন্দর। এখানে খ্রীষ্টান, ইহুদী, মুসলমান বণিকরা বসবাস করত। বাগদাদ প্রভৃতি বিদেশের বাজারে চীনের দ্রব্য—রেশম, মশলা, পর্সেলিনের জিনিস ইত্যাদি বিক্রয় হত। বিদেশ থেকে চীনে আসত হাতীর দাঁত, গন্ধদ্রব্য, তামা, গণ্ডারের শিং, কচ্ছপের খোলস ইত্যাদি। দেশের মধ্যে অসংখ্য খাল কাটার ফলে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যও এই সময় উন্নতিলাভ করেছিল।

বৌদ্ধধর্ম—তাং যুগে চীনে বৌদ্ধধর্ম এত প্রসার লাভ করেছিল যে তাং যুগকে ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ বলা যেতে পারে। হিউএন সাঙের মত কয়েকজন চীনা বৌদ্ধ ভারতবর্ষে এসে বৌদ্ধপ্রভাবকে আরও বেশি করে দেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থও এই সময় চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। অনেক মৌলিক বৌদ্ধ গ্রন্থও রচিত হয়েছিল চীনা ভাষায়। সপ্তম শতাব্দীতে হুই নেং নামে এক দার্শনিক বৌদ্ধ ধর্মকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন। মূল বৌদ্ধ ধর্মের নানারকম শাখা প্রশাখাও এই সময় সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সম্রাট কাও সুং-এর উপদেষ্টা উ হো নামে এক রমণী বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

হিউ-এন সাঙের ভারত ভ্রমণ—৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউ-এন সাঙ ভারতবর্ষে বৌদ্ধ তীর্থগুলি দর্শনের উদ্দেশ্য যাত্রা করেন। প্রায় ষোল বছর তিনি এদেশে ছিলেন। ভারতে বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থে ঘুরে, বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে বসে জ্ঞান সঞ্চয় করে, বহু দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধ পুঁথি সংগ্রহ করে তিনি দেশে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে তিনি সেই সব পুঁথি চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর প্রচারের ফলে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম চীনে এনে দিয়েছিল এক বিরাট ঐক্য। হিউ-এন সাঙের বিদেশ ভ্রমণ চীনাদের মধ্যে দেশ ভ্রমণের বাসনা জাগায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে ৬৭১ বা ৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে ই-চিং ভারত ভ্রমণে যাত্রা করেন। এর ফলে চীনাদের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং বাইরের জগতের প্রভাব চীনে প্রবেশ করে চীনাদের জীবনকে বদলে দিতে থাকে।


হিউ-এন সাঙ

প্রতিবেশী রাজ্যে চীনের প্রভাব—তাং যুগের চীন থেকে বৌদ্ধ ধর্ম কোরিয়া ও জাপানে প্রবেশ করেছিল! তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মও চীনের বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ছাত্ররা চীনে পড়াশুনা করতে যেত। জাপানের সাথে চীনের এই সময় দূত বিনিময়ও হয়েছিল। জাপানের প্রথম রাজধানী 'নারা' চীনের রাজধানী 'চাংগান'-এর অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। চীন থেকে এই সময় কাগজের ব্যবহার সমরখন্দে প্রবেশ করেছিল! এইভাবে তাং যুগে চীনের সভ্যতা পূর্বে ও পশ্চিমের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

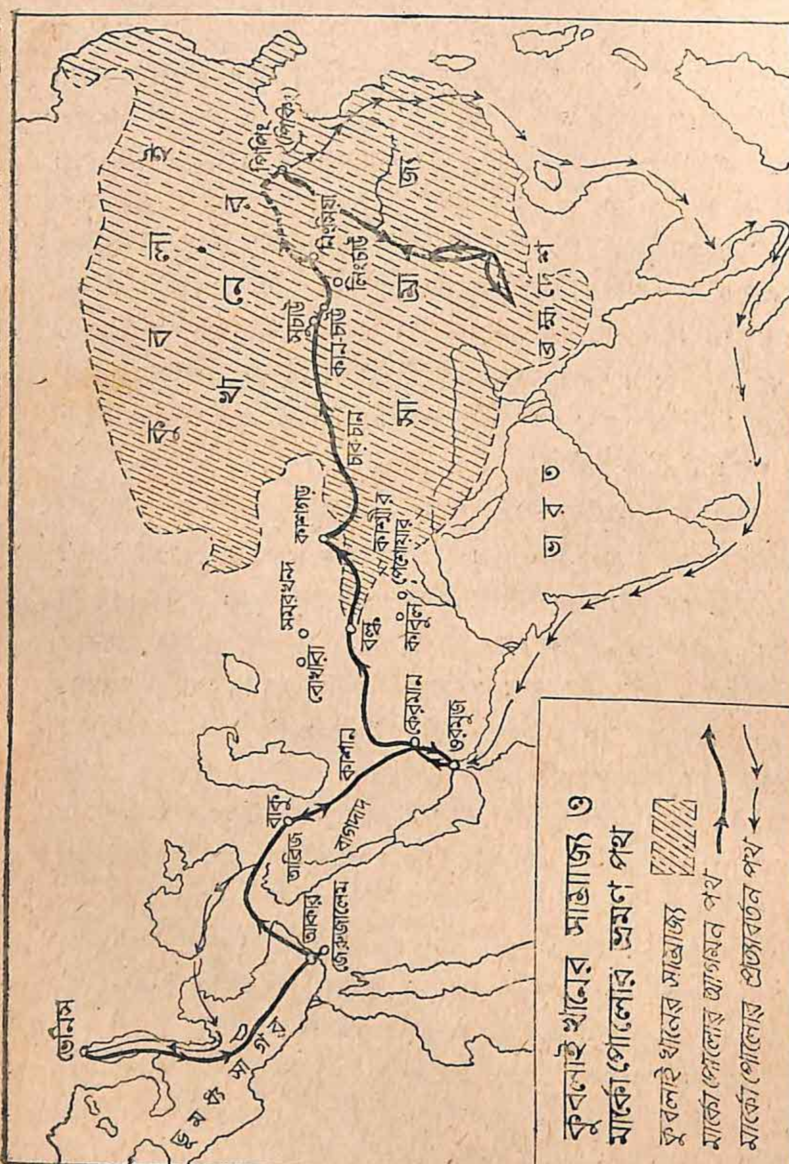
সুং যুগ (৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ)—থাং যুগের পর চীনের ইতিহাসে বিখ্যাত যুগ হল সুং যুগ। এই যুগেই ওয়াং আন্-শি নামে এক বিখ্যাত প্রশাসক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্য সম্পাদন করেছিলেন। এই সংস্কারের ফলে চীনের বাণিজ্যের উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হল। প্রত্যেক জেলার উদ্বৃত্ত ফসল সরকার কিনে নিত এবং সেই ফসলের যোগান—অর্থাৎ কৃষিকাজ—যাতে ঠিক থাকে তার জন্য সরকার কৃষকদের টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করল। ফলে কৃষকদের চড়া সুদে আর মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হত না। কৃষকদের সুবিধার জন্য জমির উপর কর ব্যবস্থাকে সরল করা হয় এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়। ধনী ও সম্পত্তির মালিকদের উপর সম্পত্তি কর বসিয়ে সরকার নিজের আয় বাড়াতে লাগল। ওয়াং আন্-শির সংস্কার কার্যের ফলে কৃষকদের অনেক সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংস্কারাবলীর বিরোধিতা হতে থাকে এবং তা অবশেষে পরিত্যক্ত হয়।

সুং যুগের সংস্কৃতি—সুং যুগের সংস্কার কার্যকে বুঝবার জন্য জনসাধারণের মনে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিকে বুঝবার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এই সময় সনাতন কনফুসিয়াসের মতবাদকে নূতন করে বুঝবার প্রেরণা জাগে। বর্তমানকে বোঝা আর অতীতকে জানা এই দুইয়ের প্রেরণায় চীনে গদ্য সাহিত্য এবং তার সাথে তাল দিয়ে মুদ্রণ শিল্পও বিকাশলাভ করতে থাকে। সুমা কুয়াং নামে ঐতিহাসিকের লেখা এই যুগের শিক্ষার বিশিষ্ট নিদর্শন। এই সময় চীনে পরীক্ষা ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছিল। সুং যুগের অঙ্কন শিল্পর প্রসারের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এই সময় থেকে পর্সেলিন অঙ্কনের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।

ইউয়ান যুগ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীঃ)ঃ কুবলাই খাঁ—সুং যুগের পর প্রায় অষ্টআশি বছর মোঙ্গোল নামে এক বিদেশী জাতি চীনে রাজত্ব করে। এই বিদেশী শাসন চীনের ইতিহাসে ইউয়ান যুগ নামে পরিচিত।

মোঙ্গোলদের রাজা ছিলেন কুবলাই খাঁ। তিনি প্রায় চোদ্দ বছর (১২৮০-১২৯৪) চীন শাসন করেছিলেন। অবশ্য এর অনেক আগেই চীনের উত্তর সীমান্তের বেশ কিছু অঞ্চল তাঁর অধিকারে এসেছিল। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরই প্রায় সমস্ত চীন কুবলাই খাঁর শাসনভুক্ত হয়। কুবলাই খাঁর আগে কোন বিদেশী রাজা চীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি।

তাছাড়া কুবলাই খাঁর সাম্রাজ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এর ফলে কুবলাই খাঁর শাসনাধীন চীন এক বৃহত্তর মহাদেশব্যাপী সাম্রাজ্যের



অন্তর্ভুক্ত হয়। কুবলাই খাঁ কোরিয়া, জাপান, ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত চম্পা প্রভৃতি দেশ জয় করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। ব্রহ্মদেশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কুবলাই খাঁ সমস্ত ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি নিজে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের প্রতি বেশি আসক্ত ছিলেন। তাঁর সময় তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। কুবলাই খাঁ প্রত্যেক জাতির সক্ষম লোকদের নিয়ে সরকার গঠন করেছিলেন। জনসাধারণের প্রতি তিনি নিপীড়নের বদলে পোষণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময় রাস্তা ঘাটের উন্নতি হয়েছিল, সরকারী শস্য ভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছিল এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিল।



কুবলাই খাঁ

কুবলাই খাঁর মৃত্যুর পর কয়েকজন দুর্বল শাসক চীনে রাজত্ব করেন। সুঙ তা নামে এক সেনানায়কের বিদ্রোহের ফলে ১৩৬৮ সালে চীনে মোঙ্গোল শাসনের অবসান ঘটে।

মার্কো পোলো—মোঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খাঁ ও তার সময়ের চীনের অনেক কথা আমরা মার্কো পোলো নামে এক বণিকের বিবরণ থেকে জানতে পারি। মার্কো ছিলেন ইটালীর অন্তর্গত ভেনিস শহরের বাসিন্দা। তাঁর বাবা ও কাকা ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। তাঁরা একবার খোয়ারিজম রাজ্যের বোখারা শহরে যান এবং সেখান থেকে ব্যবসা করার জন্য চীনের রাজধানী পিকিং শহরে এসে উপস্থিত হন। সেখানে কুবলাই খাঁ তাদের ব্যবহারে অত্যান্ত সন্তুষ্ট হয়ে কয়েকজন যাজক আনার জন্য অনেক টাকা পয়সা দিয়ে তাদের দেশে পাঠিয়ে দেন।



মার্কো পোলো

দু’বছর পরে পোলোরা হাঁটাপথে চীনের দিকে যাত্রা করলেন এবার তাঁরা মার্কোকেও সঙ্গে নিলেন। পারস্য হয়ে পামির মালভূমির উপর দিয়ে, তারিম নদীর উপত্যকার ভেতর দিয়ে তাঁরা ১২৭৫ সালে চীনে পৌঁছান। তখন মার্কোর বয়সমাত্র একুশ বছর। কুবলাই খাঁ তাদের সমাদরে গ্রহণ করেন। মার্কোর ব্যবহারে খুশি হয়ে তিনি মার্কোকে সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় সংবাদ আদান-প্রদানের ভার দিলেন। পরে তিনি তাঁকে হ্যাঙচাও শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

ষোল বছর চীনদেশে থাকার পর পোলোরা দেশে ফেরেন। ১২৯২ সালে এক মোঙ্গোল রাজকন্যাকে পারস্যে পৌঁছে দেবার কাজ নিয়ে তাঁরা জলপথে সুমাত্রা, ভারতবর্ষ ও পারস্যের পথ ধরে দু’বছর পরে দেশে পৌঁছান। কুবলাইখাঁর কাজে মার্কোকে সারা চীন দেশে ঘুরতে হয়েছিল। ফলে তিনি চীন সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই উপাদান তিনি একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থ পরবর্তীকালে কলম্বাসের মনে প্রেরণা জাগিয়ে ছিল।

মার্কো পোলোর বিবরণ: মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনীতে চীন ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চল এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রাচ্য দেশের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি চীনের সম্রাট কুবলাই খাঁর সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখে গেছেন। কুবলাই খাঁ দেশবিদেশের গল্প শুনতে ভালবাসতেন। বিভিন্ন দেশে কি কি আশ্চর্য বস্তু পাওয়া যায়, সেখানে মানুষদের পোষাক, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার কি রকম এই কাহিনী শুনতে কুবলাই খাঁ ভালবাসতেন! পিকিং শহরটি ছিল তাঁর রাজধানী। এই শহরটি ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই প্রাচীর বেষ্টনীর মাঝখানে আরও একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছোট শহর ছিল। তার মধ্যে ছিল কুবলাই খাঁর রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদের দেওয়াল, ছাদ, মেঝের এক একটি অংশ সোনারূপা দিয়ে মোড়া ছিল, আর তার মধ্যে ছিল বিচিত্র কারুকার্য। মার্কোপোলো লিখেছেন যে পিকিং হল সত্যই একটা বড় নগরী। লোকসংখ্যায় এবং ঐশ্বর্যে পৃথিবীতে তার তুলনা ছিল না। চীন দেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। তার নাম হ্যাং চাও। মার্কো পোলো কিছুদিন হ্যাং চাও শহরের শাসন কর্তা ছিলেন। হ্যাং চাও শহরটির পরিধি ছিল বিরাট। শহরে ছিল ইট ও পাথরে বাঁধানো দীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথ। তার দুপাশে ছিল বড় বড় বাড়ী। রাস্তা দিয়ে সর্বদা যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ী চলাচল করত। শহরের ভিতরে ও বাইরে ছিল অনেকগুলি চওড়া খাল,

আর সেই খালগুলির উপর অসংখ্য সেতু। শহরে মধ্যে ছিল দশটি বড় বাজার – প্রত্যেকটি আংমাইল করে লম্বা। শহরের চারিদিকে ছড়নো ছিল দোকান-পাট, ভারতীয় বণিকদের পাথরের গুদাম ঘর এবং জন সাধারণের জন্য অনেক স্নানাগার। হ্যাং চাও রেশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল।

মার্কো পোলো লিখেছেন যে কুবলাই খাঁনের সাম্রাজ্য ছিল সুবিশাল। সারা দেশময় ছড়ানো ছিল বৌদ্ধবিহার, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, পুষ্পোদ্যান ও পান্থশালা। চীনের শিল্প ছিল নিখুঁত, শিল্পীরা ছিল দক্ষ। জরি ও রেশমের সূক্ষ বস্ত্র, সোনা-রূপা, সুরম্য অট্টালিকা বড়বড় বন্দর, অসংখ্য ভান্ডার-গৃহ ও বিপণির জন্য চীনবিখ্যাত ছিল।

মার্কো পোলো জাপান, সুমাত্রা, চম্পা, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান, নিকোবর, ভারতবর্ষ ও সিংহল সম্বন্ধে অনেক কাহিনী লিখে গেছেন। এই সব কাহিনী সব সত্য নয়। জাপানে সোনার গাছে সোনার ফল ও সোনার পাখী ব্রহ্মদেশের হাজার হাজার সাদা হাতী, ভারতে কাকতীয় রাজ্যের রাণী রুদ্রাম্মার সাহস ও বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ, ভারতীয় যোগী, সাধু ও সন্ন্যাসীদের যোগবলের অপূর্ব ক্ষমতা মার্কোপোলোর বিবরণীতে স্থান পেয়েছে। মোটের উপর মার্কোপোলো পাশ্চাত্ত্যের মানুষদের কাছে এক নূতন আজব জগতের সন্ধান এনে দিয়েছিলেন ইউরোপের মানুষ বুঝতে পারলো যে ঐশর্য ও সামরিক শক্তিতে, সভ্যতায় ও শিল্প সম্ভারে তাদের থেকে বড় ও উন্নত মানুষ পৃথিবীর আরেক প্রান্তে বসবাস করছে।

সংক্ষিপ্তসার—চীনের মধ্যযুগ বলতে তাং যুগ, সুং যুগ এবং ইউয়ান যুগকে বোঝায়। তাং যুগ চীনের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। এই বংশের রাজত্বকালে চীনে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এ যুগেই কনফুসিয়াসের দর্শনের ভিত্তিতে চীনের আইনগুলিকে সংস্কার করা হয়েছিল। শিক্ষার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছিল। এই যুগে চীনের কাব্য অসাধারণ উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। অংকন শিল্পেরও উন্নতি হয়েছিল প্রচুর। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে তাং রাজত্বে পৃথিবী সর্বপ্রথম মুদ্রণ শিল্প গড়ে উঠেছিল। এ যুগের আরেকটি বড় ঘটনা হল চা পানের প্রসার। কৃষি ছিল জীবিকার প্রধান উপায় এবং বাণিজ্যও অবহেলিত হত না।

তাং যুগে চীনে বৌদ্ধধর্ম এত প্রসার লাভ করেছিল যে এই যুগকে চীনের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ বলা যেতে পারে। এই সময় চীন থেকে বৌদ্ধ ধর্ম কোরিয়া ও জাপানে প্রবেশ করেছিল। তাং যুগের ন্যায় সংস্কৃতি দিক থেকে সুং যুগও উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকে পর্সেলিন অংকনের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। সুং যুগের পর অষ্টআশি বছর মোঙ্গোল নামে এক বিদেশী জাতি চীনে রাজত্ব করে। এই বিদেশী শাসন চীনের ইতিহাসে ইউয়ান যুগ নামে পরিচিত। এই মোঙ্গোলদের রাজা ছিলেন কুবলাই খাঁ। তাঁর সময়ের চীনের অনেক কথা মার্কো পোলো নামে এক ভেনেসিয় বণিকের বিবরণ থেকে জানতে পারি।

অনুশীলনী

১। তাং যুগ চীনের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ কেন ?

২। তাং যুগে চীনের ঐক্য কি ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ? তাং যুগের চীন প্রতিবেশী রাজ্যের উপর কি প্রভাব রেখেছিল ?

৩। মধ্যযুগে চীনের কাব্য, সাহিত্য ও অঙ্কন শিল্পের কি উন্নতি হয়েছিল ? চীনে গদ্য সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল কোন যুগে ?

৪। মধ্যযুগে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের কি উন্নতি হয়েছিল ?

৫। ওয়াং আন্-শির সংস্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৬। মধ্যযুগে চীনের বাণিজ্যের কি উন্নতি হয়েছিল ? চীনের মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। চীনের ইতিহাসে মার্কো পোলো এবং হিউয়েন সাঙ্ বিখ্যাত কেন ?

৮। কুবলাই খাঁ কে ছিলেন ? তাঁর কৃতিত্ব কোথায় ?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। তাং বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?

২। তাং যুগে কোন্ দার্শনিক বিখ্যাত ছিলেন ?

৩। চীনের ইতিহাসে কোন যুগকে বৌদ্ধযুগ বলা যায় ?

৪। ওয়াং-আন্-শি কে ছিলেন ?

৫। সুং যুগের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের নাম লেখ।

শূন্য স্থান পূর্ণ কর—

১। মোঙ্গলদের রাজা ছিলেন— — — —

২। মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ ও তাঁর সময়ের চীনের অনেক কথা আমরা —— — নামে এক বণিকের বিবরণ থেকে জানতে পারি।

(খ) মধ্যযুগের জাপান

[সম্রাট ও সমাজ ; চীনের প্রভাব ; বৃহৎ গোষ্ঠী ও পরিবারগুলির রাজতন্ত্রবিরোধিতা ও স্বাধিকার প্রয়াস ; শোগুনতন্ত্র ; সামুরাই ।]

চীনের প্রতিবেশী যে দেশ মধ্যযুগের চীনা সভ্যতার দান অকাতরে গ্রহণ করেছিল সে দেশে হল জাপান। মোঙ্গোলীয় জাতির মানুষরাই হল জাপানের অধিবাসী। খ্রীষ্টীয় শতকের শুরুতে এই মোঙ্গোলীয় জাতি জাপানে ইয়ামাটো নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। জাপানের রাষ্ট্র আর চীনের রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে একই সভ্যতার দান। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল চীনে বহু শতাব্দী আগে। এই সভ্যতা থেকে জাপান পেয়েছিল তার শিল্প-শিক্ষা-দর্শন অথচ জাপান যখন তা আত্মসাৎ করল তখন সেটা সম্পূর্ণভাবে হয়ে দাঁড়াল জাপানের নিজস্ব সম্পদ, বিদেশী প্রভাবের চিহ্ন বড় বেশি একটা রইল না। জাপানের সভ্যতা কালক্রমে হয়ে উঠল চীনের সভ্যতার থেকে স্বতন্ত্র, বিবর্তনের নিজস্ব ধারার মধ্যে দীপ্যমান।

সম্রাট ও সমাজ : জাপানের সম্রাটের নামটি বড় কাব্যিক—**মিকাডো** (Micado)। মিকাডোর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে ছ'শ বছর আগে। এই অর্থে মিকাডো পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজবংশ। জাপানদের প্রথম মিকাডো—জিমু তেনো—ছিলেন সূর্যের বংশধর। তাই মিকাডোয় রাজবংশ হল সূর্য বংশ। জাপানীরা প্রকৃতির পূজা করত। তাই সূর্য বংশের শাসনকে তারা একচ্ছত্র বলে মেনে নিল, কারণ এই বংশ প্রকৃতির দান। জাপানের প্রাচীন ধর্ম ছিল শিন্টো ধর্ম (Shintoism)। মিকাডো ছিলেন সেই ধর্মের সর্বোচ্চ পুরোহিত। রাজা ও পুরোহিত, ধর্ম ও রাজ্য শাসন—এই দুই মিলে তৈরী হল এক বিরাট ক্ষমতা, সমাজ জুড়ে ব্যাপক ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য। পরবর্তীকালে একমাত্র মুসলমান জগতের পবিত্র খলিফারা এই রকম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বারশত বছর পর্যন্ত মিকাডো ছিলেন জাপানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আধার।

মিকাডো যে সমাজের প্রধান ছিলেন সেই সমাজ ছিল গোষ্ঠী ভিত্তিক। জাপানের কয়েকটি নাম করা গোষ্ঠী (clan) হল ইয়ামাটো, সোগা, সাৎসুমো, চোসু, তোসা, হিজেন ইত্যাদি। এদের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী হল ইয়ামাটো। তারাই জাপানের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোষ্ঠীগুলির

স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা প্রথম থেকে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কি সম্রাটের দরবারে কি নিজেদের এলাকায় প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রাধান্য বজায় ছিল। ফলে কৃষকদের জমি ও তার রাজস্ব প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণভুক্ত ছিল। কৃষকদের ঐশ্বর্য এরা আত্মসাৎ করতেন। রাজার লোকজন যাতে খাজনা নিতে না আসে তার জন্য তারা রাজ দরবারের প্রাধান্য খাটাতেন।

এই ঘটনার ফল হল দুটি এক, রাজস্ব না পেয়ে রাজা ক্রমশই দুর্বল হতে লাগলেন এবং দুই, সমস্ত রাজস্ব গোষ্ঠীপ্রভুদের পায়ের তলায় বিকিয়ে দিয়ে কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে পড়ল। রাজার ক্ষমতা এবং কৃষকদের শ্রমের ফসল শোষণ করে যে গোষ্ঠীরপ্রভুরা ক্ষমতাশালী হয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের যাবতীয় অর্থ ব্যয় করতেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায়। এর ফলে কৃষক ও জমির আসল অধিকার চলে যায় বৌদ্ধ মঠগুলির হাতে। এই ব্যবস্থায় লাভবান হয়েছিলেন একদিকে গোষ্ঠীপ্রভুরা ও অন্যদিকে বৌদ্ধমঠ ও সন্ন্যাসীরা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এক দিকে দেশের রক্ষক স্বয়ং রাজা এবং অন্য দিকে দেশের যাবতীয় অন্নের যোগানদার অসংখ্য কৃষক যারা শেষ পর্যন্ত প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। রাজাকে নিষ্ক্রিয় করে, কৃষকদের দলিত করে মধ্যসত্বাধিকারী উদ্বৃত্তভোগীদের উত্থানই হল জাপানী সামন্ততন্ত্র।

চীনের প্রভাব: চীন ও জাপান একই সভ্যতার দান বলে চীনের কাছ থেকে জাপান শিখেছিল ভাষা ও বর্ণমালা, শিল্প ও দর্শন, আর শিখেছিল ব্রোঞ্জের ব্যবহার, মূল্যবান পাথর, আয়না, তলোয়ার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান। অনেক বছর আগে যখন মোঙ্গোল জাতির লোকেরা জাপানে এসেছিল তারা সাথে নিয়ে এসেছিল আয়না; তলোয়ার ও হীরামুক্তার মত দামী পাথর। পরবর্তীকালে এই তিনটি জিনিসই জাপানী রাজতন্ত্রের অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে ইয়ামাটো যুবরাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওয়ানি নামে এক চীনা পন্ডিতকে কোরিয়া থেকে জাপানে নিয়ে যাওয়া হয়। ওয়ানি যাবার পর চীনা ভাষা ও লিখন পদ্ধতিও জাপানে প্রবেশ করল। ভাষার সাথে জাপানী দরবার গ্রহণ করল বৌদ্ধধর্ম। চীন ও জাপান, উভয় দেশেই বৌদ্ধধর্ম থাকার ফলে দুই দেশের মধ্যে দেওয়া নেওয়া বেড়ে গেল।

জাপানের দৃষ্টিতে ছিল তাং যুগের সমৃদ্ধ চীন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনের অনুকরণে জাপান তার করব্যবস্থা, ভূমি-বন্দোবস্ত, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি ঢেলে সাজাল। এই সব পরিবর্তন জাপানের ইতিহাসে মহান সংস্কারকার্য নামে পরিচিত। চীনের রাজধানীর অনুকরণে জাপানের

প্রথম রাজধানী 'নারা'র পত্তন হল। জাপানের জাতীয় চরিত্রে শেখার ঔৎসুক্য অন্যের কাছ থেকে জানার আগ্রহ ছিল বলে এত সব কাজ জাপান করতে পেরেছিল! জা ানের এই উৎসাহ পরবর্তীকালে জাপানকে বড় হতে সাহায্য করেছে।

বৃহৎ গোষ্ঠী পরিবারগুলির রাজতন্ত্রবিরোধিতা ও স্বাধিকার প্রয়াস ঃ তাং যুগের সমারোহ জাপানকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু সেই চীনের ঐক্যবদ্ধ শাসন-প্রণালীর কোন আভাস গোষ্ঠী-বিভক্ত জাপানী সমাজকে স্পর্শ করেনি। এক সম্রাট, এক শাসনের পতাকাতলে যে সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় চীনের কাছ থেকে এই শিক্ষা জাপান কোনদিন গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রের অলংকাররূপে সম্রাট সবার উপরে থাকলেও প্রত্যেকটি গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য একদিকে রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করত এবং অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধে ব্যস্ত থাকত। সেই সুযোগ নিয়ে প্রত্যেক আঞ্চলিক প্রভু ও বৌদ্ধ শিন্টো মঠগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে প্রচুর সৈন্য রাখতে শুরু করে। সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যে রাজধানী সেখানে পর্যন্ত এই সব সৈন্যদের দাপট ছিল।



মিনামোটো ইয়োরিটোমো

এইভাবে চলতে থাকলে প্রথমে ফুজিওয়ারা নামে একটি পরিবার ক্ষমতা অধিকার করে সারা দেশে সামরিক শাসন চালু করে। প্রায় চারশ বছর ফুজিওয়ারার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ফুজিওয়ারার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে

নেয় টায়রা নামে একটি সামরিক পরিবার। পরে টায়রার হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয় মিনামোটো নামে আরেকটি সামরিক পরিবার। ইয়োরিটোমো নামে এক দুর্ধর্ষ মিনামোটো নায়ক বাকুফু নামে এক কঠিন শাসনতন্ত্র রচনা করে। দেশের সম্রাট তখন এক অক্ষম কিশোর। তিনি ইয়োরিটোমোকে 'বর্বর-বিনাশকারী সেনাপতি' জাপানী ভাষায় 'সেই-ই তাই-শোগুন', বা সংক্ষেপে 'শোগুণ'—এই উপাধিতে ভূষিত করেন। মিনামোটো পরিবারের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয় হোজো নামে আরেকটি পরিবার।

শোগুণতন্ত্র ঃ শোগুনের ক্ষমতাকে বলা হয় শোগুনেট বা শোগুনতন্ত্র। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে টাকুগোয়া পরিবারের হাতে শোগুণের সমস্ত ক্ষমতা চলে যায়। আড়াইশ বছরেরও বেশি সময় ধরে টাকুগোয়া পরিবার জাপানকে শাসন করছে। এই সময় সম্রাট হয়ে রইলেন অন্তরালে বন্দী, নিষ্ক্রিয় দর্শক। টাকুগোয়াদের সময় জাপান বহির্বিশ্বের সাথে সব যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। ক্রমে শোগুণরাও খুব বিলাসী ও দুর্বল হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতকে ইয়োরোপীরা এসে জাপানের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটায়। শোগুণের প্রকৃত উত্থান আরম্ভ হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন আশিকাগো টাকোজি নামে এক ব্যক্তি শোগুণ হন। তারপর প্রায় পঁচিশ বছর রাজতন্ত্র বিলীন হয়েছিল। ১৮৬৭ সালে সম্রাট তাঁর হৃতক্ষমতা ফিরে পান।

সামুরাই ঃ সামন্ততন্ত্রের যেমন একটি প্রভু শ্রেণী থাকে যারা শ্রম না দিয়ে অন্যের শ্রমের ফসল আত্মসাৎ করে বেঁচে থাকে সেই রকম থাকে একটি যোদ্ধৃশ্রেণী যাদের কাজ হয় যুদ্ধ করা। ইয়োরোপে এদের বলা হত নাইট, জাপানে সামুরাই। সামুরাইরা প্রথমে ছিল সাহসী ও বীর, বিষয়-সম্পত্তির প্রতি অনাসক্ত, প্রভুভক্ত, আত্মত্যাগ ও সেবার নীতিতে বিশ্বাসী। তাদের জীবিকা ছিল লড়াই করা। ক্রমেই তারা অলস হয়ে পড়ে। তখন তারাও কোন শ্রম না দিয়ে রাজস্বের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে বেঁচে থাকতে লাগল। সমাজে রাজা তাঁর অনুচরেরা ছিলেন প্রথম শ্রেণী, আর সামুরাইরা দ্বিতীয় শ্রেণী। কিন্তু তাদের হাতে অর্থ, অবসর এবং অস্ত্র থাকার ফলে ক্ষমতার দিক থেকে তারাই হয়ে দাঁড়াল সমাজের প্রধান শ্রেণী।

সামুরাইদের জীবন চর্যার কতকগুলি নীতি ছিল। এই নীতিগুলিকে বলা হয় বুশিডো। বুশিডো হল জাপানের শিভ্যালরি। 'সত্যনিষ্ঠা, সাহস, ঔদার্য, বিনয়, নিষ্ঠা, মর্যাদাবোধ, অর্থের প্রতি অনাসক্তি ও সংযম'—এই ছিল বুশিডোর নীতি। টাকুগোয়া শোগুণের সময় এই সব নীতি বিধিবদ্ধ

হয়। জাপানের শাসকরা দীর্ঘকাল ধরে ছিলেন যোদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক। তাদের সংযত ও সংগঠিত করার জন্যই বুশিডোর সৃষ্টি হয়েছিল। সামুরাই-দের কতকগুলি স্তর ছিল। প্রথম স্তরে ছিল সামন্ত প্রভুরা। তাদের বলা হত 'ডাইমিও'। শোগুন ছিলেন এই দলের লোক। শোগুণের অনুচরদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল সামুরাইদের দ্বিতীয় স্তর। তাদের বলা হত 'হাতা-মোতো'। তৃতীয়স্তরে সামুরাইদের বলা হত 'বইসিন্'। তারা ছিল হাতামোতোদের অনুচর। সর্বশেষ স্তরের সামুরাইদের বলা হত 'রেনিন'। তারা ছিল স্বাধীন সৈন্য। তারা পাকাপাকি ভাবে কোন প্রভুর দাসত্ব গ্রহণ করত না।

সামুরাইরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জাপানের ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছিল। ১৮৬৭ সালে জাপানে রাজতন্ত্র হৃতমর্যাদা ফিরে পায়। তখন সামুরাইদের একচ্ছত্র আধিপত্য ও সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বেশ কিছুটা নষ্ট হয়। সামুরাইরা তাদের ক্ষমতার হ্রাস ও গৌরবের হানিকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের মধ্যে কোন কোন মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য লিপ্ত হয়ে ভাগ্য পরিবর্তনকে মেনে নেয়। কিন্তু বেশির ভাগ সামুরাইরা তাদের ভাগ্যবিপর্যয়কে মানতে না পেরে জাপানের সমাজে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মত বিরাজ করতে থাকে। পরবর্তীকালে এই বিক্ষুব্ধ সামুরাইদের বংশধরেরা বহির্বিশ্বে জাপানের সাম্রাজ্যকে বিস্তার করতে চেষ্টা করেছিল।

সংক্ষিপ্তসার—জাপানের অধিবাসী হল মোঙ্গোলীয় জাতির মানুষরা। জাপানের রাজবংশ পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজবংশ। মিকাডো ছিলেন সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যে সমাজের প্রধান ছিলেন সেই সমাজ ছিল গোষ্ঠীভিত্তিক। গোষ্ঠীগুলি ছিল প্রথম থেকেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। ক্রমে রাজার শক্তি গেল কমে আর গোষ্ঠীপ্রভুরা কৃষকদের শোষণ করে লাভবান হতে লাগলেন। প্রত্যেকটি গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য একদিকে রাজতন্ত্রের বিরোধীতা করত এবং অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে বিরোধে ব্যস্ত থাকত। ধীরে ধীরে জাপানের শাসন ক্ষমতা "শোগুনের" হাতে চলে যায়। শোগুনের ক্ষমতাকে বলা হয় শোগুন তন্ত্র। ইয়োরোপে যেমন ছিল নাইট, জাপানে তেমনি ছিল সামুরাই। বুশিডো হল জাপানের শিভ্যালরি।

অনুশীলনী

১। চীন সভ্যতার কাছে জাপান কিভাবে ঋণী ?
২। মিকাডো সম্বন্ধে কি জান ?
৩। জাপানের সামন্ততন্ত্রে গোষ্ঠীদের ভূমিকা কি ছিল ?
৪। জাপানের ইতিহাসে শোগুনতন্ত্রের ভূমিকা কি ছিল ?

৫। কোন শ্রেণীর লোককে জাপানে সামুরাই বলা হত? তাদের জীবন-পদ্ধতি কি ছিল?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। জাপানের সম্রাটকে কি বলা হত?
২। জাপানের মধ্যযুগের কয়েকটি গোষ্ঠীর নাম কর।
৩। জাপানের প্রথম রাজধানীর নাম কি ছিল?
৪। 'শোগুন' কথার অর্থ কি?
৫। সামুরাই কারা?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১। মিকাডোর রাজবংশ হল ——।
২। জাপানের প্রাচীন ধর্ম ছিল ——ধর্ম।
৩। শোগুনের প্রকৃত উত্থান আরম্ভ হয়েছিল——শতাব্দীতে।

সঠিক উত্তরে √ চিহ্ন বসাও—

১। জাপানের প্রাচীন ধর্ম ছিল—বৌদ্ধ, হিন্দু, শিণ্টোধর্ম।
২। জাপানের প্রথম রাজধানীর নাম——টোকিও, নারা।
৩। বাকুফু রচনা করেন—টায়রা, হোজো, ইয়োরিটোমো।
৪। সর্বশেষ স্তরের সামন্তদের বলা হত—বাইসিন, ডাইমিও, রোনিন।
৫। বুশিডো হল—জাপানী যুদ্ধ, জাপানী ধর্ম, জাপানী শিভ্যালরি।
৬। সামুরাইয়ের দ্বিতীয় স্তরকে বলা হত—ডাইমিও, বাইসিন, হাতামতো।

একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের ভারতবর্ষ

[ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণ ও গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন : তোরমান ও মিহিরকুল ; হূণ শক্তির পতন ; হূণদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ; গুপ্তযুগের পরের ভারত : হর্ষবর্ধন ; রাজ্যবিস্তার ; চরিত্র ও শাসন প্রণালী ; হর্ষবর্ধনরে ধর্ম ; হিউ-এন-সাঙের ভারতে আগমন ; হিউ-এন সাঙের ভারতবিবরণ ; নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় ; হর্ষোত্তর যুগে ভারতবর্ষ (৮ম-১২শ শতাব্দী) ; রাজপুত জাতি ; ত্রিপাক্ষিক সংগ্রাম ; হর্ষোত্তর কাশ্মীর ; মধ্যযুগের বাংলা ; শশাঙ্ক ; পাল রাজবংশ ; সেন রাজবংশ ; পাল ও সেন যুগের সংস্কৃতি ও সমাজ ; সাহিত্য ও শিল্প ; দাক্ষিণাত্য : চালুক্য ও পল্লব রাজবংশ : নরসিংহ বর্মণ (৬৩০-৬৬৮খ্রী:) চালুক্য ও পল্লব স্থাপত্য ও শিল্প ; চোলযুগের সামুদ্রিক প্রাধান্য ।]

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে চলেছিল এক ঐক্য ও সমৃদ্ধির যুগ। এই সমৃদ্ধির পথ রচনা করেছিলেন গুপ্তসম্রাটগণ। রোম সাম্রাজ্যে যেমন পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশগুলোকে এক শাসনাধীনে এনে স্থাপন করেছিল এক মহান ঐক্য, গুপ্ত সাম্রাজ্যও তেমনি বহুখণ্ডে বিভক্ত ভারতবর্ষকে দিতে পেরেছিল এক রাজনৈতিক ঐক্য। শিল্প বাণিজ্য, সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুপ্তসম্রাটগণ এক গৌরবময় যুগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ইয়োরোপে বিশাল রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল হূণ জাতির আক্রমণে। একই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আরেকদল হূণের আক্রমণে ভারতবর্ষে গুপ্তসাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে।

ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণ ও গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন : হূণরা ছিল এক দুর্ধর্ষ জাতি। তারা ছিল এশিয়ার মোঙ্গোল জাতির একটি শাখা। চীনের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল ছিল তাদের আদিম বাসস্থান। চীনে হান সাম্রাজ্য স্থাপনের পর হূণ জাতি পশ্চিমদিকে ইয়োরোপের অভিমুখে চলে যেতে বাধ্য হয়। তাদেরই একটি শাখা মধ্য এশিয়ার অক্ষুনদীর উপত্যকায় বসবাস আরম্ভ করে। কালক্রমে শ্বেতহূণ নামে এরা পরিচিত হয়। ভারতবর্ষে প্রথম হূণ

আক্রমণ হয়েছিল ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। গুপ্তসম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে প্রথম হূণ আক্রমণের কথা শোনা যায়। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত সেই আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন। তাঁর মৃত্যুর (৪৬৭ খ্রীঃ) পরে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে শ্বেতহূণেরা গুপ্তসাম্রাজ্যকে আক্রমণের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পারস্য, কাবুলের মধ্যদিয়ে তারা ভারতের সীমান্তে এসে পৌঁছায় এবং শিয়ালকোট অধিকার করে। ক্রমে তারা তাদের ক্ষমতা মালব পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। অন্যদিকে আত্মকলহ ও প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের নিজ নিজ রাজ্য গড়ার প্রয়াস গুপ্তসাম্রাজ্যকে পতনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

তোরমান ও মিহিরকুল : হূণদের নেতা ছিলেন তোরমান। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে দুর্বল এবং বিভক্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে তিনি পাঞ্জাব থেকে মালব পর্যন্ত এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন। অনেক ভারতীয় নৃপতি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এবং ভারতীয় প্রথানুযায়ী তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। হিউএন সাঙের বিবরণে দেখা যায় বালাদিত্য নামক গুপ্ত সম্রাটের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিহিরকুল রাজা হয়েছিলেন। পাঞ্জাবের অন্তর্গত শাকলনগরী (বর্তমান শিয়ালকোট) ছিল তার রাজধানী। শিবের উপাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর। পাহাড়ের উপর থেকে হাতিকে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে তার আর্তনাদ শোনাই ছিল তাঁর আনন্দ।

হূণ শক্তির পতন : মিহিরকুলের নৃশংস অত্যাচার হূণশক্তির পতনকে ডেকে আনে। ভারতের অনেক রাজাই তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। একবার তিনি মগধের রাজা পরবর্তী গুপ্তবংশীয় নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের নিকট পরাজিত হন। আরেকবার পশ্চিম মালবের অধিপতি যশোধর্মন তাঁকে পরাজিত করে হূণশক্তির পতন ঘটান। মিহিরকুল আরও কিছুকাল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে।

হূণদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব : বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল হূণদের আক্রমণে। হূণশক্তি ধ্বংস হবার পরেও কিন্তু গুপ্তসাম্রাজ্য তার পূর্বগৌরব আর ফিরে পায় নি। ভারতবর্ষ হারাল তার ঐক্য। গড়ে উঠল ছোট ছোট রাজ্য। তাদের মধ্যে যশোধর্মনের রাজ্য, পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে মগধ ও মালবের পূর্ব অংশ, গৌড়, মৌখরি বংশের অধীনে কনৌজ এবং পুষ্যভূতি বংশের অধীনে থানেশ্বর রাজ্য ছিল প্রধান। চীনা পরিব্রাজক

হিউএন সাঙ এবং কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহনের লেখায় ভারতবর্ষে হূণদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও কিন্তু ভারতীয় ধর্ম তাদের আকৃষ্ট করেছে। কালক্রমে তারা হিন্দুধর্ম ও আচারপদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং তাদের মুদ্রায় ভারতীয় শিবমূর্তি ও তাঁর প্রতীক 'বৃষ' অঙ্কিত করেছে। বৌদ্ধধর্মের ছিল তারা প্রচণ্ড বিরোধী। পরবর্তীকালে তারা বিশাল হিন্দু-সমাজে মিশে যায়। তাদের রক্ত শরীরে বহন করে আর পরে গুর্জরপ্রতিহার ইত্যাদি রাজপুতজাতিগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল।

গুপ্তযুগের পরের ভারত : হর্ষবর্ধন : গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশ বছর পরে হর্ষবর্ধন নামে পুষ্যভূতিবংশীয় একজন রাজা উত্তরভারতে আবার এক রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে তিনি নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন নি।

পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন হর্ষবর্ধনের পিতা। তিনি তাঁর শ্রীময়ী কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌরাজ গ্রহবর্মার বিবাহ দেন। তাঁর জেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধনের রাজত্ব-কালে মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্ক সম্মিলিতভাবে গ্রহবর্মাকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে গ্রহবর্মা প্রাণ হারান এবং তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। বুদ্ধিমতী রাজ্যশ্রী একজন গুপ্তবংশীয় অমাত্যের সাহায্যে পলায়ন করে বিন্ধ্য-পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রহবর্মার মৃত্যুসংবাদে রাজ্যবর্ধন কনৌজ আক্রমণ করেন এবং দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু তার কিছুকালের মধ্যেই তিনি গৌড় বা কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের হাতে নিহত হন।



হর্ষবর্ধন

রাজবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা অষ্টদশবর্ষীয় কুমার হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য উপাধি নিয়ে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবিলম্বে তিনি ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিন্ধ্যারণ্য থেকে উদ্ধার করেন। নিরাশ রাজ্যশ্রী তখন বনমধ্যে অগ্নিতে আত্মহুতির উদ্যোগ করছিলেন। হর্ষের সভাকবি বাণভট্টের রচিত **'হর্ষচরিত'** নামক ঐতিহাসিক কাব্যে এই

ঘটনার একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। কনৌজে প্রত্যাবর্তন করে হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রী ও অমাত্যগণের অনুরোধে কনৌজের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। থানেশ্বর থেকে কনৌজে তিনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। হর্ষাব্দ বলে এই সময় থেকে এক নতুন সম্বৎ প্রচলিত হয়।

রাজ্যবিস্তার : প্রায় আটান্ন (৬০৬-৬৪ খৃঃ) বছরের রাজত্বকালে হর্ষবর্ধন উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী, পশ্চিমে বলভী থেকে পূর্বে গঞ্জাম পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। থানেশ্বর, কনৌজ, অহিচ্ছত্র (রোহিলাখণ্ড) শ্রাবস্তী, প্রয়াগ ইত্যাদি ছিল তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। রাজা হয়ে হর্ষবর্ধন চেয়েছিলেন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে। রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী গৌড়াধিপতি শশাঙ্ককে পরাজিত করার জন্য তিনি মালবরাজ মাধবগুপ্ত এবং পূর্বে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়া গেলেও শশাঙ্ক যে ৬১৯-৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। (গৌড়াধিপতির মৃত্যুর পরে অবশ্য ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) অধিকার করেছিলেন।) পশ্চিমে বলভীর রাজাকে তিনি পরাজিত করে তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দেন এবং তাকে অধীনস্থ রাজারূপে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। তাঁর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেষ্টা ব্যর্থ করেন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী। হর্ষবর্ধন ছিলেন সকলোত্তরাপথনাথ। উত্তরভারতে তিনি রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন কিন্তু গুপ্তযুগের সর্ব ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যকে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি।

চরিত্র ও শাসনপ্রণালী : হর্ষবর্ধন ছিলেন নানা গুণের অধিকারী। রণনৈপুণ্য, শাসনদক্ষতা, প্রজাবাৎসল্য, বিদ্যোৎসাহিতা, ধর্মানুরাগ প্রভৃতি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রের মধ্যে। সাহিত্যে ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নামে তিনখানি নাটক তিনি রচনা করেন। তাঁর রচিত 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী'কে সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। হর্ষবর্ধন ছিলেন এক নিপুণ শাসক। শাসন ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করতেন। সমগ্র রাজ্যকে তিনি ভাগ করেছিলেন কয়েকটি বিষয় বা প্রদেশ এবং ভুক্তি বা জেলায়। করভার ছিল লঘু এবং বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে শ্রম দিতে বাধ্য করা হতো না। কঠোর দণ্ডবিধির দরুণ দেশে চুরি ডাকাতি ছিল না। প্রজাদের সুবিধার জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন

পান্থশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার ইত্যাদি। হিউএন সাঙএর বিবরণ থেকে জানা যায় যে হর্ষবর্ধনের অধীনে ৬০,০০০ হস্তী ও ১,০০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।

হর্ষবর্ধনের ধর্ম: হর্ষবর্ধন প্রথমে ছিলেন শৈব কিন্তু পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাজ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ করেন। অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও হিন্দু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। চীনা পরিব্রাজক হিউএন সাঙের বিবরণী থেকে তাঁর সময়ে দুটি বিশেষ ধর্মোৎসবের কথা জানা যায়। প্রথমটি কনৌজে অনুষ্ঠিত এক বিরাট ধর্ম সম্মেলন। এই সম্মেলন প্রায় একমাসকাল স্থায়ী হয়েছিল। যোগদান করেছিলেন কুড়িজন করদ রাজা ও সাতহাজার বিভিন্ন ধর্মালম্বী সাধু ও পণ্ডিত। স্বর্ণময় বুদ্ধমূর্তিসহ প্রত্যহ একটি শোভাযাত্রার শেষে হর্ষবর্ধন স্বয়ং বুদ্ধদেবের উপাসনা সম্পন্ন করে ধর্মসভার অধিবেশনে নানাপ্রকার আলোচনা রত হতেন। কথিত আছে যে সম্রাটের বৌদ্ধধর্মের প্রতি আসক্তি ব্রাহ্মণদের রুষ্ট করে এবং তাঁরা মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেন।

হর্ষবর্ধনের সময়ে আরেকটি ধর্মসম্মেলন হত গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রয়াগে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই উৎসব হত। প্রথম কয়েকদিন চলত বুদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা। তারপরে হর্ষবর্ধন সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও দরিদ্রের মধ্যে মধ্যে পাঁচ বছরের সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করতেন। অবশেষে নিজের রাজবেশটুকুও বিলিয়ে দিয়ে বুদ্ধের চরণে আত্মনিবেদন করতেন।

হিউএন সাঙের ভারত আগমন: হর্ষবর্ধনের আমলে এক চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধপণ্ডিত ভারতবর্ষে আসেন। তিনি হলেন হিউএন সাঙ। চীনা সম্রাট তাই-সুং-এর রাজত্বকালে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে চীনের রাজধানী সিয়ান-ফু থেকে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধশাস্ত্রপাঠ ও তীর্থ পরিদর্শন। তখন চীনদেশে বিদেশভ্রমণ ছিল নিষিদ্ধ তাই তাঁকে গোপনে যাত্রা করতে হয়। তিনি বিশাল গোবি মরুভূমি পার হয়েছিলেন। তিয়েনসান পর্বতের পাশ দিয়ে তিনি তাসখন্দে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে আফগাণিস্তান ও খাইবার গিরিপথ দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। ফিরে যাবার সময় তিনি পুরাতন পথ না ধরে কাশগর, ইয়ারখন্দ ও খোটানের পথ ধরে যান। চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের সহায়ক হিসাবে হিউএন সাঙের নাম অমর হয়ে আছে।

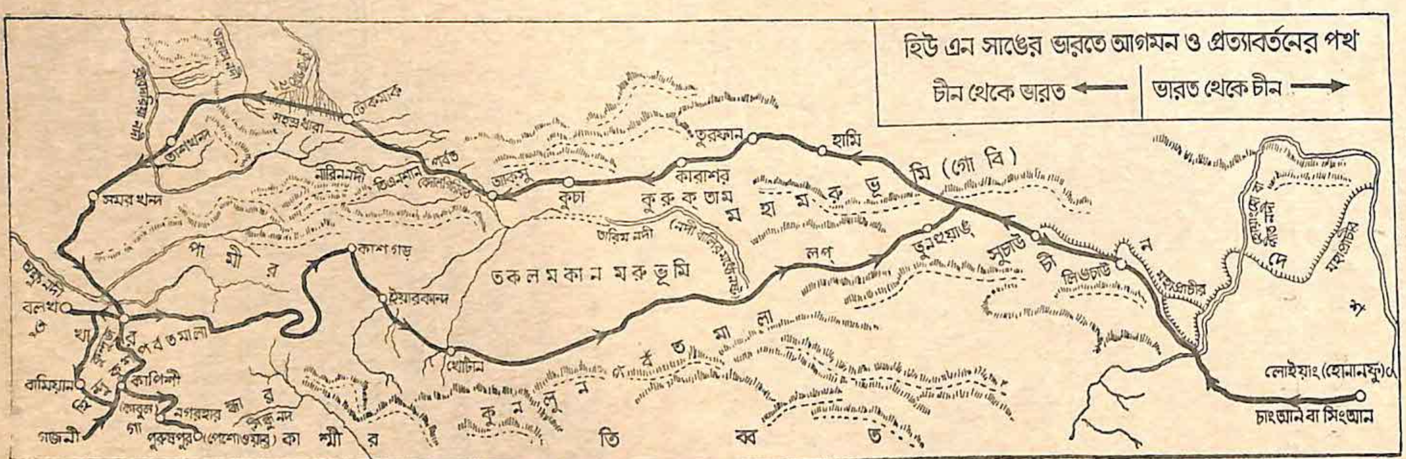
হিউএন সাঙের ভারত বিবরণ: হিউএন সাঙ ভারতবর্ষে চৌদ্দ বছর

ছিলেন ও প্রায় সর্বত্রই তিনি ভ্রমণ করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন এক অসাধারণ বর্ণনা। হূণ আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের এক বিপর্যস্ত চিত্র আমরা তাঁর বর্ণনায় পাই। বহু নগরী ও বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল হূণ আক্রমণে। লোক বসতি হয়েছিল নিশ্চিহ্ন। দেখা দিয়েছিল দস্যু ও তস্করের উৎপাত। হিউএন সাঙ নিজেও কয়েকবার দস্যুর হাতে পড়েছিলেন। গুপ্ত যুগে ফা-হিয়েনের বর্ণনায় যে শান্তি ও শৃঙ্খলার ছবি দেখা যায় হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় তা অনুপস্থিত। অবশ্য হিউএন সাঙের বর্ণনায় অনেক সমৃদ্ধশালী নগরী জনবহুল স্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্রের কথাও পাওয়া যায়।

হিউএন সাঙ হর্ষবর্ধনের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। হর্ষের রাজত্বকালের অনেক কথাই আমরা তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি। হর্ষবর্ধনের ধর্মের প্রতি অনুরাগ, কনৌজ ও প্রয়াগের মেলা 'দানক্ষেত্র' এবং 'সন্তোষক্ষেত্র' নামক স্থানে সব দান করে তাঁর নিঃস্ব হয়ে যাওয়া, এ সব তথ্যই হিউএন সাঙ আমাদের দিয়েছেন। আর দিয়েছেন রাজধানী কনৌজের সুন্দর বর্ণনা। বিশাল প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত নগরটি উদ্যান এবং সরোবর দ্বারা ছিল সুসজ্জিত। কনৌজের অধিবাসীদের উত্তম স্বাস্থ্য হিউএন সাঙকে বিস্মিত করেছিল। তাঁদের শিল্প, বিদ্যা ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

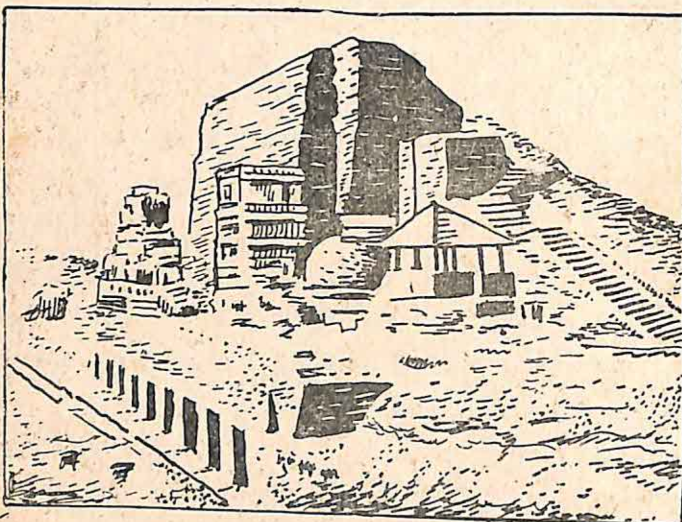
হিউএন সাঙ দাক্ষিণাত্যের চালুক্য ও পল্লব রাজ্যেও গিয়েছিলেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন হর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী। উত্তরে নর্মদা থেকে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তাঁর রাজধানী ছিল বাতাপী নগরী। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে ছিল পল্লবদের রাজ্য। অসাধারণ শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য পল্লবেরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কাঞ্চী নগরী ছিল পল্লবদের রাজধানী। পল্লবশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহাবলী-পুরম বা মামল্লপুরমের রথের মত সাতটি মন্দির।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। হিউএন সাঙ নিজে এখানে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেছেন। তখন প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং শিক্ষক সংখ্যা প্রায় একশ। এখানে বৌদ্ধ দর্শন, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। এখানে গ্রন্থাগার ও গবেষণার মানমন্দির ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করতেন দেশের রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।



হিউ এন সাঙের ভারতে আগমন ও প্রত্যাবর্তনের পথ
চীন থেকে ভারত
ভারত থেকে চীন
হামি
তুরফান
কারাশর
কুচা
আকসু
তৈকমাক
সহস্রধারা
তালাখান
সমরখন্দ
বলখ
বামিয়ান
কাপিশী
নগরহার
গজনী
পুরুষপুর (পেশোওয়ার)
কাশগড়
ইয়ারকন্দ
খোটান
লপ
তুনহুয়াঙ
সুচাউ
লিঙচাউ
মহাপ্রাচীর
লোইয়াং (হোনানফু)
চাংআন বা সিংআন
মি (গো বি)
মহামরুভূমি
তকলমকান মরুভূমি
তরিম নদী
নারিন নদী
পামীর
হিন্দুকুশ পর্বতমালা
কুয়েনলুন পর্বতমালা
তিব্বত
কাশ্মীর
চীন

ছাত্রদের কোন খরচ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ছিল কষ্টসাধ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় পাটনা জেলার বড়গাঁও গ্রামে।



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তুপ

হর্ষোত্তর যুগে ভারতবর্ষ ঃ (৮ম —১২শ শতাব্দী) গুপ্তযুগের অবসানের পরে হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে কিছুদিনের জন্য এক রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাস নানাবিধ আঞ্চলিক রাজ্যের ইতিহাস। এইসব আঞ্চলিক রাজ্যের অনেক রাজাই তাঁদের বিভিন্ন দেব-বেদীর বংশসম্ভুত বলে দাবি করতেন। নিজেদের তারা রাজপুত বলতেন। তারা মনে করেন যে কৃষ্ণ, রাম, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি পৌরাণিক উৎস থেকে তাঁদের নিজেদের বংশের সূচনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বর্ণের মানুষও যেমন ছিল তেমন ছিল বহিরাগত জাতিদের থেকে উদ্ভূত মানুষ। উৎস যাই হোক না কেন সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে এই রাজপুতদের অবদান অনস্বীকার্য।

রাজপুত জাতি ঃ রাজপুতদের মধ্যে দক্ষিণ রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহার, বারাণসী ও অযোধ্যা অঞ্চলের গাহাড়ওয়াল বা গাড়োয়াল (পরবর্তী কালের রাঠোর), সম্ভর ও আজমীর অঞ্চলের চৌহান, জেজাকভুক্তির (পরবর্তী বুন্দেলখন্ড) চন্দেল এবং মালবের পারমার বংশ ছিল উল্লেখযোগ্য। রাজপুত

সামন্ত প্রভুরা রাজার অধীনে থেকেও প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য তাঁরা রাজাকে সামরিক সাহায্যও দিতেন।

প্রায় দুশ বছর ধরে রাজপুত প্রতিহার বংশ কনৌজে রাজত্ব করেছিল। রাজত্বের শেষের দিকে গজনীর সুলানমামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং তৎকালীন প্রতিহার রাজা রাজ্যপালের আনুগত্য লাভ করেন। তাঁর এই কাপুরুষতা চন্দেল রাজা গন্ডকে ক্রুদ্ধ করেছিল। তিনি কনৌজ আক্রমণ করে রাজ্যপালকে হত্যা করেন বটে কিন্তু স্থায়ী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গাহাড়ওয়াল রাজা চন্দ্রদেব কনৌজের প্রতিহার শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

ত্রিপাক্ষিক সংগ্রাম: হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতের রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছিল কনৌজকে ঘিরে। কনৌজের অধিকার নিয়ে ত্রিমুখী লড়াই চলেছিল বাংলার পাল, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট ও উত্তর ভারতের প্রতিহার বংশের মধ্যে। প্রতিহার রাজা নাগভট্ট বাংলার রাজা ধর্মপালের আশ্রিত কনৌজের শাসক চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। কিন্তু নিজে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দের (৭৯৩—৮১৪খৃীঃ) কাছে পরাজিত হন। কিন্তু কনৌজকে কেন্দ্র করে কোন সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গঠিত হয়নি।

হর্ষোত্তর কাশ্মীর: খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কাশ্মীরে কার্কট বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। জনৈক সামন্ত দুর্লভবর্ধন এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজা ললিতাদিত্য কনৌজের রাজা যশোবর্মণকে আক্রমণ করে তাঁর রাজ্য জয় করেন। কথিত আছে মগধ, গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গও ললিতাদিত্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। কার্কট বংশের পরও উৎপল ও লহোর বংশ নামে দুটি রাজবংশ আরও কিছুকাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেন।

মধ্যযুগের বাংলা: প্রাচীন কালে বাংলা দেশের সাধারণ তিনটি ভাগ ছিল—উত্তরবঙ্গ 'বরেন্দ্রভূমি' বা 'পুন্ড্রবর্ধন', পশ্চিমবঙ্গ বা 'রাঢ়' দেশ এবং পূর্ববঙ্গ বা শুধু বঙ্গ। আর্যসভ্যতা বাংলাদেশে অনেক পরে এসেছে। মৌর্য ও গুপ্তযুগে পুন্ড্রবর্ধন ছিল সাম্রাজ্যের একটি ভুক্তি বা প্রদেশে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিন-জন স্বাধীন বাঙালী নরপতির নামও উল্লেখযোগ্য –গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। নালন্দার প্রখ্যাত অধ্যক্ষ শীলভদ্র ছিলেন বাংলার পন্ডিত।

শশাঙ্ক ঃ বাঙালী রাজাগণের মধ্যে শশাঙ্কই ছিলেন প্রথম সার্বভৌম নরপতি। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই তিনি একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী। বারাণসী থেকে উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই রাজ্যবিস্তারের সূত্র ধরেই কনৌজের মৌখরিবংশীয় রাজা গ্রহবর্মণ ও পরে হর্ষবর্ধনের সাথে তার বিরোধ হয়। শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। হিউএন সাঙ তাঁকে পরম বৌদ্ধবিদ্বেষী বলে বর্ণনা করেছেন। কথিত আছে বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত বোধিবৃক্ষটি তিনি স্বহস্তে উৎপাটিত করেন।

পাল রাজবংশ : শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে চলতে থাকে ঘোর অরাজকতা। এই বিশৃঙ্খলা অবসানের জন্য অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার প্রবীণ নেতাগণ নিজেদের মধ্যে বিবাদ ভুলে গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসান। এইভাবে বাংলাদেশে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পাল-রাজারা প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। বাংলা দেশের ইতিহাসে পাল-রাজা ধর্মপালের রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সমগ্র আর্যাবর্তে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। তিনি কনৌজের ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করলেও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট রাজা ধ্রুব ও তাঁর পুত্র দেবপাল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরবসাগর পর্যন্ত স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। ভারতের বাইরেও তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করেছিল। আরব পর্যটক সুলেমানের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে দেবপালের সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রকুট এবং প্রতিহারদের অপেক্ষা সুদক্ষ ও শক্তিশালী ছিল।

সেন রাজবংশ ঃ একাদশ শতাব্দীতে সামন্ত সেন এবং তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন কর্ণাটক থেকে বাংলাদেশে এসে রাঢ় অঞ্চলে একটি রাজত্ব স্থাপন করেন। বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশে প্রথম স্বাধীন রাজা। সমগ্র বাংলাদেশে তিনি তাঁর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র বল্লাল সেন সাম্রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে ছিলেন। বাংলার হিন্দুসমাজে তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মানুরাগী। শেষ সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাংলাদেশ জয় করেন। ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ারের হাতে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের ঘটনাটি 'তবকৎ-ই-নাসিরি' নামক একটি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। গ্রন্থটি মৌলানা

মিনহাজ-উদ-দিন-এর লেখা। আসলে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন অনেক সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের দ্বারপ্রান্তে যখন তিনি পৌঁছালেন তখন তাঁর সাথে মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। মুসলমানরা আগেই ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে এসেছিল। ফলে বাংলাদেশ জয় করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়নি। তারা মগধ জয় করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। লক্ষ্মণ সেন তাদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়ত করেছিলেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা সফল হয়নি।

পাল ও সেন যুগের সংস্কৃতি ও সমাজ ঃ পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশে কৌলিণ্য প্রথার প্রচলন ছিল। অসবর্ণ বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। বিভিন্ন পূজা পার্বণের সঙ্গে ছিল নানা প্রকারের আমোদের ব্যবস্থা। নৃত্য, গীত, বারো মাসে তের পার্বণ,শ্রদ্ধাদিতে দান ব্রাহ্মণ ভোজন, প্রায়শ্চিত্ত বিধি ইত্যাদি লেগেই ছিল। এছাড়াও ছিল নানারকম দেশাচার ও কুলাচার। পুরুষেরা ধুতি ও উত্তরীয় পরত। চামড়ার জুতোর প্রচলন ছিল না বলে কাঠের খড়ম বেশি ব্যবহৃত হত। হাতে তাদের থাকত লাঠি এবং মাথায় ছাতা। মেয়েদের সাজসজ্জায় সৌখীনতা ছিল। তারা শাড়ী ও ওড়না ব্যবহার করত। কাজলের টিপ, পায়ে আলতা, গায়ে চন্দনের গুঁড়ো, খোঁপায় ফুল দিয়ে তারা নিজেদের সজ্জিত করতে ভালবাসত, সোনা, রূপা, হীরা,মুক্তা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে পুরুষরাও অলঙ্কার ব্যবহার করত। রাজপুরুষরাও পরতেন ক্ষৌম বস্ত্র, কানে কুণ্ডল, হাতে কঙ্কন, গলায় মালা এবং কটিতে তরবারি। রাজপরিবারের মেয়েরা সমস্ত গায়ে অলঙ্কার পরতেন।

সাধারণ মানুষ নিরামিষ ও আমিষ—দুই প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করত। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীতে ফল, শাক, ব্যঞ্জন, ঘি, দুধ, পিঠে, পায়েস ইত্যাদি খাদ্যের উল্লেখ আছে। মাছ এবং মাঝে মাঝে মাংসও তারা খেত। শাক্তগণ পশুবলি দিতেন। বৈষ্ণবরা করতেন মহোৎসব। আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। পাশা ও দাবাখেলা সকলের কাছে খুব প্রিয় ছিল। নারীদের জন্য কড়িখেলা, গোলকধাম খেলা ইত্যাদি। পুরুষেরা শিকার, মল্লযুদ্ধ, তীরধনুক ও তরবারির খেলা, নৌকাবিহার ইত্যাদিতে আনন্দ উপভোগ করতেন। নৃত্যগীত, যাত্রাভিনয়, কবির লড়াই আমোদের উপকরণগুলির মধ্যে ছিল অন্যতম।

সাহিত্য ও শিল্প—পাল ও সেন যুগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যাচর্চা শিল্প-বাণিজ্য ও ধনসম্পদে বাংলার গৌরবময় যুগ। সাহিত্যে এইসময়ে অনেকেই

প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী ও সেনরাজসভায় পঞ্চরত্ন সরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধর ও জয়দেব। সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালের মন্ত্রী ও সভাকবি ছিলেন। তাঁর রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থের প্রতি ছত্রের দু'রকম অর্থ করা যায়। একরকম অর্থ করলে শ্রীরামচন্দ্রের গল্প আর অন্যরকম অর্থ করলে পাওয়া যায় পালরাজ্য রামপালের কাহিনী। বল্লালসেনের 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ধোয়ী লিখেছিলেন কালিদাসের মেঘদূতেক অনুকরণে 'পবনদূত' নামে একখানি কাব্য। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী নিয়ে রচনা করেছিলেন 'গীতগোবিন্দ'। গল্পে আছে যে তাঁর অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণ স্বয়ং জয়দেবের বেশ ধরে এসে গীতগোবিন্দের একটি অসমাপ্ত পদ পূর্ণ করে দেন। তাঁর ভাষা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। এছাড়া সেনযুগে রচিত হয়েছিল হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব" নামে সমাজধর্মের গ্রন্থ, পশুপতির 'শ্রাদ্ধপদ্ধতি' এবং সর্বানন্দের' টীকা। এগুলিতে লেখকদের অগাধ পান্ডিত্য প্রকাশ পায়।

বাংলাদেশের সর্বত্র বহু শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধবিহারগুলি। ছাত্রদের কোন ব্যয়ভার বহন করতে হত না। অনেক নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল পালরাজাদের উৎসাহে। তার মধ্যে মগধে ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা এবং উত্তরবঙ্গে সোমপুরী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। হিউএন সাঙ ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড় পরিদর্শন করেছিলেন। এখানে ২০টি সংঘারামে ৭০০ বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করত। শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বিক্রমশীলা। বাঙালী অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন এর অধ্যক্ষ। তিব্বতের রাজার অনুরোধে তিনি বাংলার রাজা নয়পালের সময় হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। সেখানেই তাঁরা মৃত্যু হয় (১০৫৩ খ্রীঃ)। শিল্প ও বাণিজ্যেও বাংলাদেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। শিল্পী ধীমান ও তাঁর পুত্র বীটপাল কারুশিল্পে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। বাংলার শিল্প ও ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন ভারত মহাসাগরে দ্বীপাঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রলিপ্ত ছিল এক সুপ্রসিদ্ধ-বন্দর পালযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল আর সেনযুগে বিকাশ লাভ করেছিল সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম।

দাক্ষিণাত্য : চালুক্য ও পল্লব রাজবংশ : হর্ষবর্ধনের পরে উত্তর ভারতের মতন দক্ষিণ ভারতেও কয়েকটি আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব হয়। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট, বাতাপীর চালুক্য, কাঞ্চীর পল্লব এবং তাঞ্জোরের

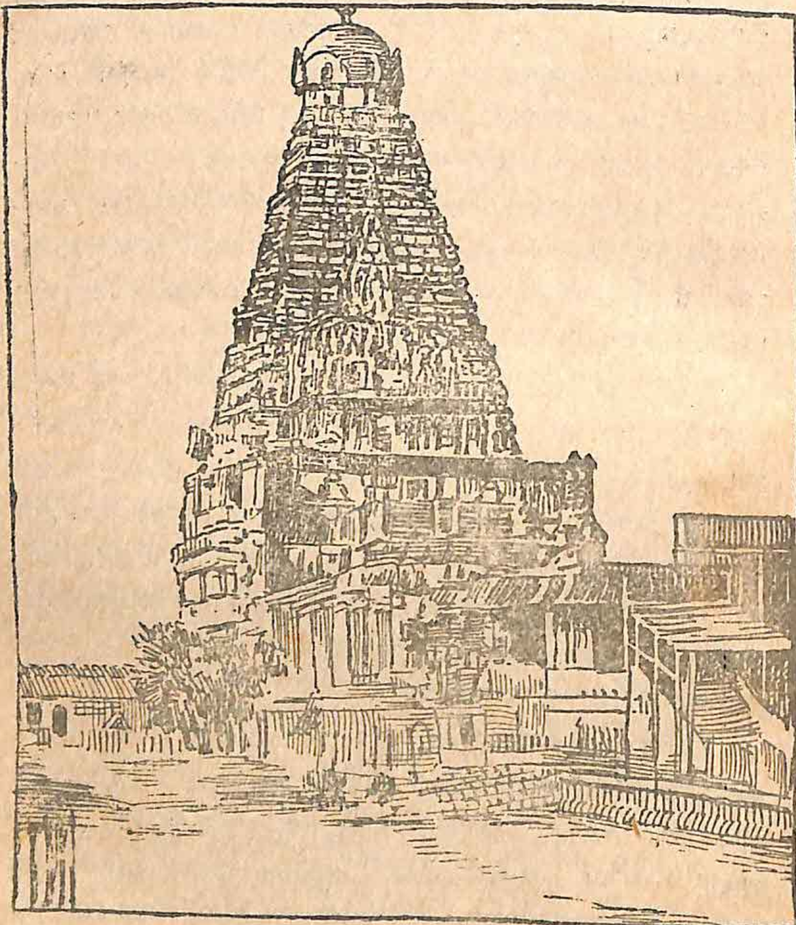
চোলবংশ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। চোল ও চালুক্য এবং পল্লব ও চালুক্যদের মধ্যেসংঘর্ষ চলেছিল অনেকদিন ধরে। চালুক্যরা প্রথমে ষ'ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দী এবং পরে দশম থেকে দ্বাদশ শতব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাতাপীর চালুক্যরাই প্রথমে প্রধান ছিলেন কিন্তু পরে বেঙ্গীর চালুক্য, কল্যাণের চালুক্য, গুজরাটের চালুক্যদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৬৪২ খ্রীঃ)। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল মহীশূর থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরের মালব ও গুজরাটের অধিপতিরা এবং দক্ষিণে চোল, কেরল পান্ড্য-রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্যে রাজ্য-বিস্তারের পথ তিনি বন্ধ করেন। পল্লবগণকেও তিনি পরাজিত করেন কিন্তু পরে পল্লবদের হাতেই তাঁর পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটে। তাঁর সময়ে হিউয়েন সাঙ চালুক্যরাজ্যও পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

নরসিংহ বর্মণ (৬৩০-৬৬৮খ্রীঃ) ছিলেন পল্লববংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনি তিনবার যুদ্ধে পরাজিত করেন। চালুক্য রাজধানী বাতাপী তিনি দখল করেন এবং 'মহামল্ল' আখ্যায় নিজেকে ভূষিত করেন। তাঁর সময়ে হিউএন সাঙ পল্লবরাজ্য পরিভ্রমন করেন। তিনি পল্লব রাজধানীতে একশ বৌদ্ধ মঠ ও দশহাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শন পান। এছাড়া কাঞ্চী নগরীতে আশিটি জৈন মন্দির ও কিছু হিন্দু মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। পল্লব ও চালুক্যদের সংঘর্ষের ফলে উভয় রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে তাদের পতন ঘটে।

চালুক্য ও পল্লব স্থাপত্য ও শিল্প : শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন চালুক্য রাজারা। বাদামীর গুহা মন্দির, চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের সঙ্গমেশ্বর মন্দির এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বিরূপাক্ষ মন্দির স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। অজন্তার কয়েকটি গুহাচিত্র চালুক্য আমলে আঁকা হয়েছিল। এলিফেন্টার গুহামন্দিরগুলিও এই একই যুগে নির্মিত হয়েছিল।

পল্লবরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেম। কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির ও মহাবলপুরকের রথ মন্দিরগুলি পল্লবশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাঞ্চীর আন্যান্য মন্দিরগুলির মধ্যে ঐরাবতেশ্বর মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের সময় পাদুকোট গুহাগাত্রের চিত্রগুলি ক্ষোদিত হয়েছিল। তাঁর পুত্র মহামল্ল মামল্লপুরমের বিরাট বিরাট শিলাখন্ড খোদাই করে নানা মন্দির ও মূর্তি নির্মান করেন। এইগুলি মামল্লপুরমের

বিখ্যাত রথ নামে। প্রকৃতপক্ষে এই রথগুলি পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণ কর্তৃক নির্মিত মহাবলীপুরমের 'সপ্তরথ' মন্দির—এবং কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির পল্লব স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পরবর্তীকালে পল্লবশিল্পের সাথে



দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোর মন্দির

চোল শিল্পের সাদৃশ্য দেখা যায়। পাহাড় কেটে এই সব নির্মাণ কৌশল ও এদের গঠন সৌন্দর্য আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

চোলযুগের সামুদ্রিক প্রাধান্য : অনেক প্রাচীন গ্রন্থে চোলদের সামুদ্রিক কর্মতৎপরতার উল্লেখ আছে। চালুক্য ও পল্লবরাজাদের মত স্থল বাহিনী ছাড়াও চোলরাজাদের একটি সুগঠিত নৌবাহিনী ছিল। করমণ্ডল ও মালাবারের

উপকূল রক্ষা করার ব্যাপারেই নৌবাহিনী প্রধানতঃ নিযুক্ত থাকত। সৈন্য স্থানান্তর করার ব্যাপারে মালবাহী জাহাজগুলি যথেষ্ট সাহায্য করত। এই নৌবাহিনীর সাহায্যেই চোলরাজগণ ভারতের বাইরে রাজ্য জয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম রাজেন্দ্র চোল তাঁর নৌশক্তির দ্বারা সমগ্র সিংহল চোল সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। এই শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে তিনি নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও মালব জয় করে অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জন করেছিলেন। সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশের বিরুদ্ধেও একটি নৌ অভিযান তিনি পাঠিয়েছিলেন। পূর্ব এশিয়ার হিন্দু রাজবংশগুলির মধ্যে শৈলেন্দ্র বংশ ছিল সকলের অন্যতম। ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে শৈলেন্দ্ররাজ বিজয়োতুঙ্গবর্মণ পরাজিত হয়ে বন্দী হন। এর ফলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের কিছু অংশ চোলদের হস্তগত হয়। কোন ভারতীয় রাজা এর আগে বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই রকম সামরিক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।

সংক্ষিপ্তসার—ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের একটি অন্যতম প্রধাণ কারণ। এই হূণদের নেতা ছিলেন তোরমান ও মিহিরকুল। মিহিরকুলের নৃশংস অত্যাচারই হূণ শক্তির পতনকে ডেকে আনে। এই হূণজাতি পরবর্তীকালে বিশাল হিন্দুসমাজে মিশে যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশ বছর পর হর্ষবর্ধন উত্তরভারতে আবার এক রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন। তিনি ছিলেন 'সকলোত্তরাপথনাথ'। তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগী।

হর্ষবর্ধনের আমলে হিউএন সাঙ ভারতে আগমন করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি এক অসাধারণ বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন।

এই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র।

বাংলাদেশে হর্ষোত্তর যুগে পাল ও সেনবংশের রাজত্ব ছিল। এই দু'টি যুগ ছিল জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যাচর্চা, শিল্প বাণিজ্য ও ধনসম্পদে বাংলার গৌরবময় যুগ। এখানকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বিক্রমশীলা।

দক্ষিণ ভারতে হর্ষোত্তর যুগে কয়েকটি আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব হয়। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট, বাতাপীর চালুক্য, কাঞ্চীর পল্লব এবং তাঞ্জোরের চোলবংশ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। চালুক্য রাজারা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পল্লবরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষোক ছিলেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে চোলদের সামুদ্রিক কর্মতৎপরতার উল্লেখ আছে।

অনুশীলনী

১। হূণ জাতি কারা? তারা কিভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল? তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি?

২। হর্ষবর্ধনের রাজ্যলাভের কাহিনী বর্ণনা কর।
৩। হর্ষবর্ধনের শাসনপ্রণালী ও ধর্ম সম্বন্ধে কি জান ?
৪। হিউ-এন-সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখ। তিনি ভারত সম্পর্কে কি লিখে গিয়েছেন।
৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৬। শশাঙ্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৭। বাংলার পাল ও সেন রাজাদের কথা সংক্ষেপে লেখ।
৮। পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশের সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে লেখ।
৯। পাল ও সেন আমলে বাংলাদেশের সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে লেখ।
১০। চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ? তার সম্বন্ধে কি জান ?
১১। চালুক্য ও পল্লব শিল্পের একটি বিবরণ দাও।
১২। চোলদের সামুদ্রিক প্রাধান্য বর্ণনা কর।

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। হূণদের আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল ?
২। ভারতবর্ষে প্রথম হূণ আক্রমণ কবে হয়েছিল ?
৩। হূণদের নেতা কে ছিলেন ?
৪। মিহিরকুল কে ?
৫। হর্ষবর্ধন কোন বংশের রাজা ছিলেন ?
৬। বাণভট্ট কোন্ কাব্য রচনা করেছিলেন ?
৭। হর্ষবর্ধন রচিত তিনখানি নাটকের নাম বল।
৮। হর্ষবর্ধনের আমলে যে চীনা পরিব্রাজক আসেন তার নাম কি ?
৯। শশাঙ্ক কার উপাসনা করতেন ?
১০। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর কে রচনা করেন ?

শূণ্যস্থান পূর্ণ কর—

১। চীনা পরিব্রাজক———এবং কাশ্মীরের ঐতিহাসিক——লেখায় ভারতবর্ষে হূণদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যায়।
২। হর্ষবর্ধন রাজা হবার পর ভগিনী——বিন্ধারণ্য থেকে উদ্ধার করেন।
৩। হিউ-এন-সাঙের বিবরণ থেকে হর্ষবর্ধনের সময়ে—বিশেষ ধর্মোৎসবের কথা জানা যায়।
৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় পাটনা জেলায় ——গ্রামে।
৫। প্রতিহার রাজা নাগভট্ট বাংলার রাজা—— আশ্রিত কনৌজের শাসক চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন।

বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের যোগাযোগ

[মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ; চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ; কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ : তিব্বতে ভারতবর্ষের প্রভাব ; চম্পা ; কম্বোজ ; যশোধরপুর (আঙ্কোর থোম ; আঙ্কোর ভাট, মালয় এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা ; শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য ; জাভা বা যবদ্বীপ বরোবুদুর ; সিংহল ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম ।]

অনেক প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সংগে বহির্বিশ্বের একটি যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ কখনোই বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সিন্ধুসভ্যতার যুগে ভারতবর্ষের সাথে যে মেসোপটেমিয়ার ঘনিষ্ঠ



সম্পর্ক ছিল সে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আবার আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর ভারতীয় সভ্যতা এবং গ্রীক সভ্যতার এক নিবিড় আদান প্রদান ঘটেছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একজন গ্রীক নাবিকের লেখায় রোম এবং ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি বাণিজ্যের জন্য রোমের মুদ্রা ভারতে চলে আসার কথা লিখেছেন। পরবর্তী কালে

ভারতবর্ষে অনেক রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ ও দেশগুলির সাথে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে সুমাত্রা, যবদ্বীপ (জাভা), বর্ণিয়ো, শ্যাম, চীন, কোরিয়া, জাপান ইত্যাদি। উত্তরে খোটান, কুচা, কাশগড়, চীন ইত্যাদির সাথেও চলত পণ্যের আদান প্রদান। ভারতের সভ্যতা এই আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার ঃ মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল স্থলপথে। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম মধ্য এশিয়াকে প্রভাবিত করেছিল। বৌদ্ধধর্ম দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি হীনযান ও অন্যটি মহাযান। এইমহাযান বৌদ্ধ ধর্মই মধ্য এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। চীনের প্রাচীর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত ছিল মোঙ্গোল, তুর্কী প্রভৃতি যাযাবর জাতির বাস। সম্ভবত ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজ্য থেকে তাদের মধ্যে ভারতীয় প্রভাব প্রবেশ করে। তারপরে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ যুগে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়। ধর্মের সাথে সাথে ভারতীয় ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে সে প্রভাব যায় চীনে, চীন থেকে কোরিয়ায় এবং সেখান থেকে জাপানে। বিখ্যাত পর্যটক অরেলস্টাইন মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার অনেক চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। বিশেষ করে খোটানে ভারতীয় নগর, বৌদ্ধমঠ ও স্তূপ, এবং হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ এই মনীষীর প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন সাঙ এ পথ অতিক্রম করার সময় ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি এখানে একশটি বৌদ্ধ বিহার ও পাঁচহাজার ভিক্ষু দেখেছিলেন।


সপ্তম শতাব্দীর চীনা বোধিসত্ত্বের মুখে

চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ঃ মধ্য এশিয়ায় থেকে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় ধর্ম চীনা পরিব্রাজকদের আকৃষ্ট করে। তাঁরা জলপথে এবং স্থলপথে ভারতে আসেন বৌদ্ধ পুঁথি এবং বুদ্ধ মূর্ত্তি সংগ্রহ করতে। এই পরিব্রাজকদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউ-

এন সাঙ ও ই সিং এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু যে চীনদেশ থেকে পরিব্রাজকরা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে এসেছিলেন তা নয়; ভারতীয় ভিক্ষুরা মাঝে মাঝেই বাণিজ্য জাহাজে করে চীনে যেতেন তাদের ধর্মকে প্রচার করতে। বৌদ্ধ পুঁথি অনুবাদ করার জন্য চীনা পণ্ডিতগণ শিখেছিলেন সংস্কৃত এবং পালি। আবার শতাধিক ভারতীয় পণ্ডিত এই কাজের সহায়তা করার জন্য চীনে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। ধর্মের যোগ ছাড়াও সুদূর প্রাচ্যের এই দেশটির সাথে ভারতের ছিল এক বাণিজ্যিক যোগাযোগ।

কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ: খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়াতে প্রবেশ করে। আরো দুই শতাব্দী পরে বৌদ্ধধর্ম সেখানে রাজপৃষ্ঠপোষকতা পায়। কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ করে। ভারতীয় ধর্মপ্রচারকেরা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জাপানে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের চার শতাব্দী পরে কোরিয়ায় ও ছয় শতাব্দী পরে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে।

তিব্বতে ভারতবর্ষের প্রভাব: ভারতবর্ষের উত্তরে দুর্গম হিমালয়ের মাঝে তিব্বত অবস্থিত। দুর্গম গিরির মাঝখানে হলেও বাইরের জগতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক ছিল। ভারতের বৌদ্ধধর্মের ঢেউ এখানে এসে পেঁছৌছিল রাজা স্রং-সান-গাম্পোর আমলে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজা চীন ও নেপালের দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই দুই মহিষীর প্রেরণাতেই তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি খোটানে মতান্তরে মগধে ব্যবহৃত ভারতীয় লিপি তিব্বতে প্রচলন করেন এবং তিব্বতীয় ভাষা ভারতীয় অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করেন। এইভাবে তিনি তিব্বতে এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথ প্রশস্ত করেন। তিব্বত থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ ভারতবর্ষে আসতে লাগলেন বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দর্শন করবার জন্য। ভারতের সঙ্গে তিব্বতের গড়ে উঠল এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিব্বত-রাজের আমন্ত্রণে বাঙালী শান্ত রক্ষিত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজধানীতে গমন করেন। বাংলার পাল রাজাদের সাথে তিব্বতের যোগ ছিল খুব নিবিড়। তিব্বতীয় সাধুদের পড়াশুনা করার জন্য তাঁরা অনেক ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই সাধুদের মধ্যে অনেকে নালন্দা এবং বিক্রমশীলার মহাবিহারে থেকে পড়াশুনা করতেন। একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতেয় গমন করেন। তারই অনুপ্রেরণায় অনেক ভারতীয় ধর্মপুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

তিব্বতীয়রা আজও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ইতালীয় পণ্ডিত তুচ্চি এবং বাঙালী মণীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল ও তিব্বতে বহু ভারতীয় গ্রন্থের মূল আবিষ্কার করেছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতি জলপথে বিস্তার লাভ করে। 'জাতকের গল্প' এবং 'কথাসরিৎসাগর'-এর উপাখ্যানে এই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। সওদাগরদের সপ্তডিঙা মধুকর বাণিজ্য করতে ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে সমুদ্রে পাড়ি দিত। ইন্দোচীন, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অঞ্চল, মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে তারা প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে আসত। এই সুবর্ণ ফসলের কথা ভেবেই ভারতীয়রা এই সমগ্র অঞ্চলটির নাম দিয়েছিল সুবর্ণ-ভূমি। বাণিজ্যের সাথে সাথে এখানে কিছু উপনিবেশ স্থাপিত হয় আবার কিছু ভারতীয় রাজ্যও গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ভারতীয় নামধারী রাজ্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত শিলালিপি এবং চীনা বিবরণ থেকে এই রাজ্যগুলি সম্পর্কে কিছু জানা গেছে। শৈব ধর্ম এখানে খুব প্রসার লাভ করেছিল তবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় খুব কম ছিলেন না। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এখানকার সমাজকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। এখানকার হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা প্রায় দেড় হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন।

চম্পা : ইন্দোচীনে ভারতীয় প্রভাবাধীনে দুটি বড় রাজ্য গড়ে উঠেছিল, একটি চম্পা ও অপরটি কম্বোজ। চম্পা ছিল হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। এখানকার আদিম অধিবাসীদের নাম ছিল 'চাম'। কথিত আছে বর্তমান বিহারের ভাগলপুর জেলার চম্পা নামে একটি স্থান থেকে একদল ভাগ্যান্বেষী এই রাজ্যে গিয়ে তাদের রাজ্য স্থাপন করে। এরা প্রায় তেরশ বছর রাজত্ব করেন। এখানকার মন্দিরগুলিতে শিব শক্তি (দুর্গা,) গণেশ, স্কন্দ (কার্তিক) বিষ্ণু এবং কৃষ্ণমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম ও এখানে প্রচলিত ছিল। চম্পা রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল ইন্দ্রপুর।

কম্বোজ : বর্তমান কম্বোডিয়ার দক্ষিণ অংশ জুড়ে ছিল কম্বোজ রাজ্য। মালয় ও ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটেছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতকে এখানে হিন্দুরাজ্যের পত্তন হয়েছিল। চীনারা এই রাজ্যের নাম দিয়েছিল ফু-নান। চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষ থেকে সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ এখানে এসেছিলেন। তাঁদের ধর্ম এবং আচার-ব্যবহার এখানকার অধিবাসীদের আকৃষ্ট করে। তারা আগে নাগ বা সাপের পূজা করত। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের নীতিকে গ্রহণ করে।

এখানকার রাজারা ভারতবর্ষ এবং চীনে দূত প্রেরণ করে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন।

যশোধরপুর (আঙ্কোর থোম)—কম্বোজের রাজধানী ছিল আঙ্কোর থোম। এই নগরের প্রাচীন নাম ছিল যশোধরপুর। নগরটি ছিল চতুষ্কোণ। নগরের চারধারে ছিল পরিখা এবং পাথরের প্রাচীর। নগরের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল বেয়নের মন্দির। মন্দিরটি ছিল পিরামিডের মত। চল্লিশটি চূড়া দ্বারা শোভিত ছিল এই মন্দির। নগরতোরণটি ছিল বড় সুন্দর। শহরের ভেতরে আরো অনেক মন্দির ছিল। অসংখ্য সরোবর ও অপূর্ব কারুমণ্ডিত সৌধ নগরের শোভা বর্ধন করত। ছেষট্টি হাত চওড়া পাঁচটি রাজপথ প্রাচীর থেকে নগরের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রথ, হাতী ও পালকিতে লোকজন যাতায়াত করত।

আঙ্কোর ভাট : আঙ্কোর থোমের একটু দূরেই অবস্থিত ছিল আঙ্কোর ভাটের জগদ্বিখ্যাত আশ্চর্য মন্দির আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলি পাথরের মন্দির তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এই মন্দিরটিকে পৃথিবীর বৃহত্তম বলে মনে করা হয়। মন্দিরটি সৌন্দর্যে অতুলনীয়। সূর্যবর্মণ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরে বিষ্ণুর পূজা হত। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে ক্ষোদিত ছিল আরো অন্যান্য দেবতার মূর্তি। তাঁদের মধ্যে আছেন নটরাজ শিব এবং কিরাতবেশী মহাদেব। প্রধান মন্দিরটিতে পৌঁছাতে গেলে অনেকগুলি সিঁড়ি এবং বহু অলিন্দ ও চত্বর পার হয়ে যেতে হত। আঙ্কোর-ভাট মন্দিরটি ছিল জল বেষ্টিত।

মালয় এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয় সভ্যতা—খ্রীষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই মালয় এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এই সব জায়গা থেকে ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম এবং ভাষা পুরাতন অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন স্থানে যেমন সুমাত্রায় বৌদ্ধধর্ম বেশী প্রভাব বিস্তার করে আবার যবদ্বীপের মত জায়গায় হিন্দুধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। গল্পে আছে ভারতীয় ঋষি অগস্ত্য যবদ্বীপে গমন করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরের-রাজপুত্র গুণবর্মন যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ফা-হিয়েন কিছুকাল যবদ্বীপে কাটান। কাঞ্চীর ধর্মপাল এবং বাংলার অতীশ দীপঙ্কর সুমাত্রা দ্বীপে কয়েক বৎসর কাটান।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মালয় এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। শৈলেন্দ্র বংশের অধীনে

এই সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল বলে এর নাম হয় শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য। রাজধানীর নাম ছিল শ্রীবিজয়। রাজাদের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যকে বর্ণনা করেছেন আরব বণিকগণ। শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ। চীন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। এই মঠের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তিনি বাংলার রাজা দেবপালের নিকট পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। কুমারঘোষ নামে এক বাঙালী বৌদ্ধ সাধু শৈলেন্দ্র বংশের গুরু ছিলেন।

জাভা বা যবদ্বীপ—জাভা বা যবদ্বীপে প্রথমে হিন্দুধর্ম ও পরে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত যবদ্বীপ শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ভারতীয় শিল্প এবং সাহিত্য যবদ্বীপেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময়ে যবদ্বীপের দেশীয় ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত অনুদিত হয়েছিল। আজও এই দুখানি মহাকাব্য এখানকার অধিবাসীদের আনন্দ দেয়।

বরোবুদুর—স্থাপত্য শিল্পে শৈলেন্দ্র রাজাদের খ্যাতি ছিল। বৌদ্ধদের বৃহত্তর মঠ বরোবুদুর তাদের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটির নির্মাণ কাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। মন্দিরটি ছয়তলা এবং পর পর নয়টি থাকে



বরোবুদুর

গঠিত হয়েছে। সবচেয়ে উঁচু থাকের মাঝখানে রয়েছে ঘণ্টাকৃতি একটি স্তূপ। উপরের তিনটি থাক রয়েছে স্তূপে ঘেরা। প্রত্যেকটি স্তূপ রয়েছে একটি করে বুদ্ধ মূর্তি। কার্নিশে, সিঁড়িগুলোর ধারে ধারে ও তোরণের উপরেও বুদ্ধদেবের জীবনী নিয়ে অনেক চিত্র খোদাই করা আছে। বরোবুদুর শিলালিপির অক্ষরগুলি ভারতীয়। মন্দিরের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ বৌদ্ধতারা দেবী। মন্দিরের অলংকরণ এবং কারুকার্য অতি অনুপম।

সিংহল ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম—সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মূলে ছিলেন সম্রাট অশোক। সিংহলের রাজা তিষ্যের অনুরোধে অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র, পৌত্র সুমন এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠান। ব্রহ্মদেশে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মরূপে গৃহীত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি যে এই অঞ্চলগুলিতে প্রসার লাভ করেছিল তার নিদর্শন পাওয়া গেছে এখানকার মন্দিরগুলিতে।

সংক্ষিপ্তসার—ভারতবর্ষ কখনোই বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষের সাথে মেসোপটেমিয়ার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী যুগেও ভারতের সাথে অন্যান্য দেশগুলির নিবিড় যোগ ছিল।

মধ্য এশিয়ার ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল স্থলপথে। এর মূল কারণ ছিল বৌদ্ধধর্ম। মধ্য এশিয়া থেকে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় ধর্ম চীনা পরিব্রাজকদের আকৃষ্ট করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়াতে প্রবেশ করে। কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ করে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতি জলপথে বিস্তারলাভ করে। এখানে ভারতীয় প্রভাবে কয়েকটি রাজ্য গড়ে ওঠে। সিংহল ও ব্রহ্মদেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি যে এই অঞ্চলগুলিতে প্রসার লাভ করেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় এখানকার মন্দিরগুলিতে।

অনুশীলনী

১। মধ্য এশিয়ায় সভ্যতা বিস্তারের কি কি নিদর্শন পাওয়া যায়?

২। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল?

৩। সুবর্ণদ্বীপ বলতে কি বোঝাত? কিভাবে সেখানে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল? আঙ্কোর ভাটের একটি বিবরণ দাও।

৪। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য কোথায় ছিল? তাঁদের স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে কি জান।

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব কোন পথে বিস্তৃত হয়েছিল?

২। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন কে আবিষ্কার করেছেন?

৩। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম কোন্ রাজার আমলে প্রসার লাভ করে?

৪। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি কোন পথে বিস্তার লাভ করে?

৫। ইন্দোচীনে ভারতীয় প্রভাবাধীনে যে দুটি বড় রাজ্য গড়ে উঠেছিল তাদের নাম লেখ।

শূন্য স্থান পূর্ণ কর—

১। রোমান ঐতিহাসিক——বাণিজ্যের জন্য রোমের মুদ্রা ভারতে চলে আসার কথা লিখেছেন।

২। বৌদ্ধধর্মের দুটি ভাগের নাম——ও——।

৩। অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন——বিহারের অধ্যক্ষ।

৪। আঙ্কোরথামের প্রাচীন নাম ছিল——।

৫। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মূলে ছিলেন সম্রাট——।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতের সুলতানী আমল (১২০৬—১৫২৬ খ্রীঃ)

[ভারতে মুসলমান আক্রমণ : আরবদের সিন্ধু বিজয় ; ভারতে তুর্কী জাতির আগমন ; ভারতবর্ষে তুর্কী আফগান জাতির আসার কারণ ; ভারতবর্ষে সুলতানী শাসনের স্বরূপ ; সুলতানী আমলে ভারতের রাজনৈতিক জীবন ; সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ; সুলতানী যুগে ইসলাম ও ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয় ; শিল্প ও সংস্কৃতি সুলতানী আমলে ইতিহাস রচনা, সুলতানী আমলে ভক্তিবাদ ; শ্রীচৈতন্যদেব ; গুরু নানক ; কবীর ; ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের যুগে বাংলার সমাজ ; বাংলা সাহিত্য ; স্থাপত্য ; সুলতানী যুগে শাসন ব্যবস্থা ।]

খলিফা হারুণ অল রশীদের মৃত্যুর পর আরবদের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে আরববা কতগুলি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। পূর্ব অংশে প্রথমে পারসিকরা এবং পরে তুর্কীরা প্রবল হয়ে ওঠে। তুর্কীরা মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থান অঞ্চলে বাস করত। আরবদের সংস্পর্শে এসে তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তারা ছিল খুব সাহসী। ভাল যুদ্ধ করতে জানত বলে খলিফারা তাদের সৈন্যদলে নিযুক্ত করতেন। ক্রমে তুর্কীরা নিজেরাই স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন।

ভারতে মুসলমান আক্রমণ : আরবদের সিন্ধু বিজয়—ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন আরবরা। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমদিকে আরবরা সিন্ধু প্রদেশ ও মুলতান অধিকার করে। প্রায় দেড়শ বছর এই দুটি অঞ্চল খলিফাদের অধিকারে ছিল। পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্যগুলির বিরোধিতায় মুসলমানরা আর অগ্রসর হতে পারে নি। এর পর প্রায় তিনশ ব র ধরে ভারতে আর কোন মুসলমান অক্রমণ হয় নি। আরবদের সিন্ধুবিজয় ভারতীয়দের জীবনযাত্রায় কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আরবদের সিন্ধুবিজয় ছিল নিষ্ফল।

ভারতে তুর্কীজাতির আগমন—আরবদের সিন্ধুবিজয়ের প্রায় তিনশ বছর পরে ভারতবর্ষে আবার মুসলমান আক্রমণ হতে থাকে। এই আক্রমণের প্রথম ঢেউ আসে গজনী রাজ্য থেকে। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আলপ্তগীন

নামে একজন তুর্কী যোদ্ধা আফগানিস্থানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল গজনী শহর। আলপ্তিগীনের পরবর্তী সুলতান ছিলেন তাঁর জামাতা সবুক্তিগীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে সিন্ধুনদ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ অধিকার করেন। তাঁর পুত্র মামুদ সতেরোবার ভরত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এইভাবে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি মুসলমান রাজ্য গড়ে ওঠে। মামুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনদৌলত লুণ্ঠন করা। মুলতান, থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা প্রভৃতি মধ্যযুগের বড় বড় শহর এবং গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির তিনি লুঠ করেছিলেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যুর পর গজনী রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। গজনীর সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘোর বা ঘুর নামে গজনীরই অন্তর্গত একটি সামন্ত রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশেষে ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘোরের সুলতান গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ গজনী অধিকার করেন। তাঁর ভাই শিহাবুউদ্দিন অথবা মুইজউদ্দিন মহম্মদকে তিনি গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইনি ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘোরী নামে প্রসিদ্ধ। নিজ বাহুবলে তিনি উত্তর ভারতের স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ভারতের শাসনভার তাঁর একজন সুদক্ষ ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন আইবকের হাতে দিয়ে তিনি গজনী ফিরে যান। এই কুতুবউদ্দিন ভারতের অভ্যন্তরে প্রথম স্বাধীন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (১২০৬ খৃীঃ)। ১২০৬ সাল থেকে ১৫২৬ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত যে কাল তাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতানী যুগ বলা হয়।

ভারতবর্ষে তুর্কী-আফগান জাতির আসার কারণ—প্রথমদিকে ভারতবর্ষে মুসলমানরা এসেছিল প্রধানতঃ লুণ্ঠন করতে। তাছাড়া ইসলাম ধর্মের কাছ থেকে তারা পেয়েছিল ধর্মপ্রচার এবং রাজ্যজয়ের প্রেরণা। আর ভারতীয় রাজাদের ঐক্যের অভাব তাদের জয়ের পথকে প্রশস্ত করেছিল। আরবরা চেয়েছিল উপনিবেশ, তুর্কীরা চেয়েছিল ঐশ্বর্য। এই দুই থেকে পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের বাসনা গড়ে উঠে।

ভারতবর্ষে সুলতানী শাসনের স্বরূপ—১২০৬ খৃীষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিনের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৫২৬ খৃীষ্টাব্দে মুঘল রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত মোট ৩২০ বছরে পাঁচটি রাজবংশ দিল্লীতে রাজত্ব করেন ঃ

১. দাসবংশ—১২০৬-১২৯০ খ্রীঃ
২. খিলজী বংশ—১২৯০-১৩২০ খ্রীঃ
৩. তুঘলক বংশ—১৩২০-১৪১৩ খ্রীঃ
৪. সৈয়দ বংশ—১৪১৩-১৪৫১ খ্রীঃ
৫. লোদী বংশ—১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ

এই পাঁচটি বংশের মধ্যে প্রথম চারটি হল তুর্কী বংশ এবং শেষেরটি হল আফগান বংশ। প্রথম তুর্কী রাজবংশকে দাস বংশ বলা হয় কারণ এই বংশের তিনজন শাসক কুতুবউদ্দিন, ইলতুৎমিস ও বলবন ক্রীতদাস ছিলেন। দাস বংশের রাজারা দুর্ধর্ষ মোঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, পাঞ্জাব, রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র, বঙ্গদেশ প্রভৃতি অধিকার করেন এবং সিন্ধু বঙ্গদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনকরেন। এইভাবে তাঁরা সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন ও তার রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। দাসবংশের রাজা বলবনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা জানতে পারি কবি আমীর খসরুর (বুলবুল-ই হিন্দ) রচনায়।

খিলজী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন খিলজী। তিনি আলেকজাণ্ডারের মত বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখতেন এবং নিজে দ্বিতীয় আলেজাণ্ডারের উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁর ইচ্ছা হল তিনি ধর্মপ্রবর্তক হবেন। অতএব নিজের মুদ্রায় তিনি নিজেকে খলিফা বলে প্রচার করলেন। তিনি আসমুদ্র হিমাচল-ব্যাপী একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি গুজরাট, মালব, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, চন্দেরী ও ধারা রাজ্য জয় করেন। চিতোরের রূপলাবণ্যময়ী রাজমহিষী পদ্মিনীকে লাভ করার জন্য তিনি চিতোর অধিকার করেন, কিন্তু পদ্মিনীকে লাভ করতে পারেন নি। তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র (মহীশূর) ও মাদুরার পাণ্ড্যরাজ্য অধিকার করেন। নিজের সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ-দমন ও সংস্কারকার্য সম্পাদনের জন্য আলাউদ্দিন বিখ্যাত হয়ে আছেন।


আলাউদ্দিন

তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। তিনিও দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি হিমালয়ের অন্তর্গত কারাজাল রাজ্যটি অধিকারের চেষ্টা করেব্যর্থ হন তিনি পারস্য বিজয়ের স্বপ্নও দেখতেন কিন্তু তা সার্থক হয় নি! তিনি তামার নোট চালু করেন এবং দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর কোন চেষ্টাই সার্থক হয়নি। তাঁর খামখেয়াল মানসিকার জন্য তিনি ইতিহাসে 'পাগলা রাজা' নামে পরিচিত।

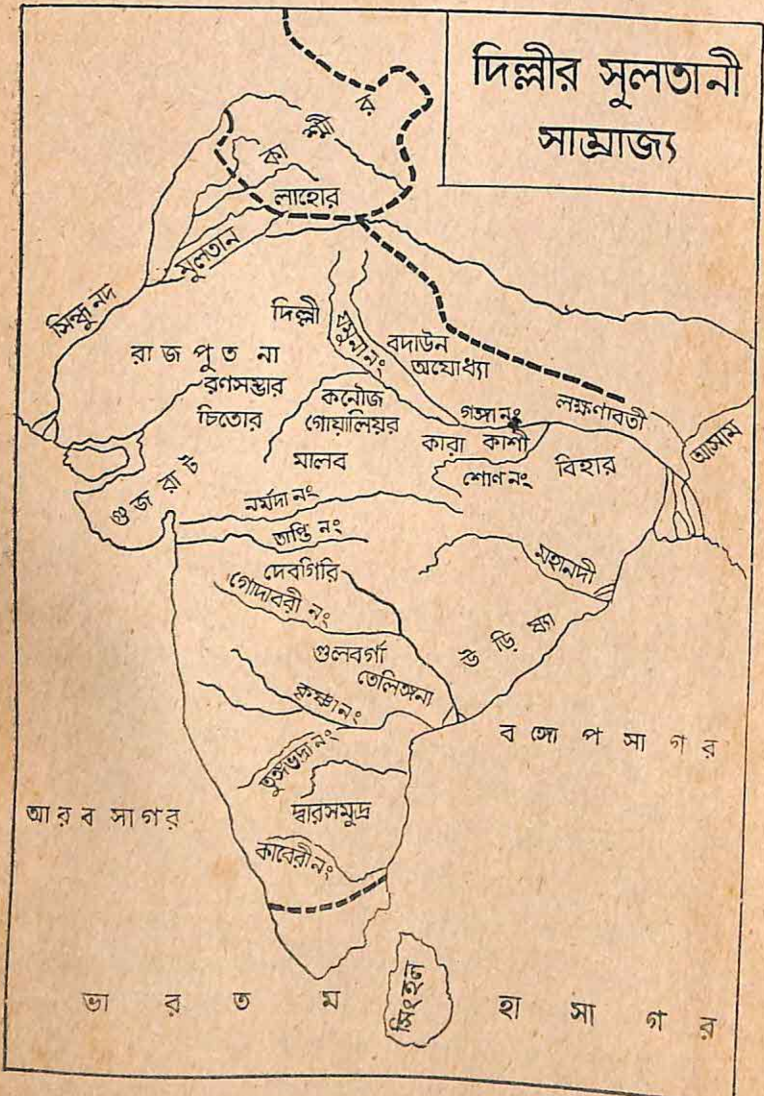


মহম্মদ বিন তুঘলক

দাস, খিলজী ও তুঘলক বংশের সুলতানদের মত সৈয়দ ও লোদী বংশের সুলতানরা উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন না। এই তিন বংশের সুলতানরা কঠোর শাসক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। সমস্ত সুলতানী যুগ ধরে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ ও বিদ্রোহ দেশের শান্তিকে বিনষ্ট করেছে। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে অনেকেই অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু বলবন ও মহম্মদ-বিন-তুঘলকের মত অনেক সুলতানই বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহী ছিলেন।

সুলতানী আমলে ভারতের রাজনৈতিক জীবন—সুলতানী আমলে রাষ্ট্র ছিল ধর্মভিত্তিক। সুলতান একদিকে ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান অন্যদিকে ছিলেন ধর্মগুরু। শাসন ছিল কেন্দ্রীয় এবং উলেমাদের প্রাধান্য ছিল খুব বেশী। বিচারের ভার ছিল কাজীর ওপর। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজনীতির প্রধান চরিত্র ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্কীরা ছিলেন প্রধান। অন্যরা আসতেন আরব, আফগানিস্থান, আবিসিনিয়া ও মিশর থেকে। নিজেদের মধ্যে এদের সর্বদা কলহ লেগেই থাকত এবং তার প্রভাব পড়ত রাজনীতিতে। রাজনীতিতে হিন্দুদের কোন বড় ভূমিকা ছিল না বললেই হয়। মোঙ্গোল জাতির উত্থানের ফলে মধ্য এশিয়া থেকে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের

লেকেদের আসা বন্ধ হয় এবং এদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কিছু কিছু সুবিধা পেতে থাকে।



সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন—সুলতানী আমলে কয়েকজন বিদেশী ভ্রমনকারী এদেশে এসেছিলেন। এদের মধ্যে আছেন নিকোলা কোন্তি, পাএস, আবদুর রজ্জাক, ইবন বতুতা, মা হুয়ান প্রভৃতিদের বিবরণ। এবং সুলতানী যুগের কবি ও ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে তখনকার সামাজিক এবং অর্থ-

নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। ধনসম্পদের জন্য ভারতের খ্যাতি ছিল। কিন্তু এই অর্থ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতেন সুলতান এবং অভিজাত সম্প্রদায়। কৃষকদের শোষন করে এরা বিলাস ব্যসনে দিন কাটাতেন। সাধারণ লোকের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তাদের করভার ছিল অত্যন্ত বেশী এবং ক্রয়ক্ষমতা ছিল না বললেই হয়। আমীর খসরু এক জায়গায় বলেছেন, 'রাজমুকুটের প্রত্যেকটি মুক্তা হল গরিবের রক্তমেশান জমাট অশ্রুবিন্দু।' কৃষি ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি। বয়ন শিল্প ছিল প্রধান শিল্প। গ্রামবাসীর চাহিদা গ্রাম নিজেই মেটাতে পারত। দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণ লোকের অবস্থা চরমে উঠত। যে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তনে গ্রাম অপরিবর্তনীয় থাকত।

মধ্যযুগে দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। অনেক সময়ে দাসরা উচ্চপদে নিযুক্ত হত। নারীদের পরদা প্রথা এ যুগেই প্রচলিত হয়। সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। ইবন্ বতুতা লিখেছেন দিল্লী সুলতানের অনুমতি নিয়ে স্ত্রীরা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতেন। এই প্রথার নাম সতী প্রথা। বিজয়নগরের স্ত্রীলোকেরা অনেক সুবিধা ভোগ করতেন। তারা লেখাপড়া, গানবাজনা শিখতেন, আবার অনেকে রাজকার্যে নিযুক্ত হতেন।

সুলতানী যুগে ইসলাম ও ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়—অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষকে বিদেশীরা আক্রমণ করছে, কিন্তু কালক্রমে নিজেদের স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে তারা ভারতীয় সভ্যতায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। মুসলমানরা এসেছিল এক ভিন্ন মত এবং ভিন্ন ধারনা নিয়ে। রাজ্যজয়ের সঙ্গে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। তাই হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংঘাত তাদের ছিল অনিবার্য। কিন্তু বহুকাল ধরে দুই সভ্যতা পাশাপাশি থাকার ফলে দুই এর মধ্যে ঘটেছিল এক অপূর্ব সমন্বয়। সত্যপীরের উপাসনায় দুই ধর্মের মিলনকে প্রত্যক্ষ করা যায়। দেশী ও বিদেশী ভাষার মিশ্রণে উর্দুভাষার উদ্ভব হয়েছিল। মুসলমান পণ্ডিতেরা হিন্দু যোগ শাস্ত্র, বেদান্ত, ভেষজ শাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আবার হিন্দুরা মুসলমানদের কাছ থেকে দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের ধারণা পেয়েছিল। মালিক মহম্মদ জয়সীমা তাঁর রচনা 'পদ্মিনী'তে হিন্দু সমাজ জীবনের চিত্র এঁকেছিলেন। অন্যদিকে মুসলিম সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে লিখেছেন হিন্দু রায় ভান মল। অনেক হিন্দু কবি উর্দুতে আবার অনেক মুসলমান কবি হিন্দীতে তাঁদের কাব্য রচনা করেন। হিন্দুদের রীতিনীতি যেমন সতীপ্রথা, জহর ব্রত ইত্যাদি মুসলমান সমাজ জীবনে প্রবেশ করেছিল। মুসলমান শাসকরা মাঝে মাঝে হিন্দু রমণী বিবাহ করিতেন। এইভাবেই দুই

সভ্যতার মাঝে বিভেদের প্রাচীর ভেঙে গিয়েছিল এবং বেজে উঠেছিল এক মিলনের সুর।

শিল্প ও সংস্কৃতি ঃ সাহিত্যে ও শিল্পে এ যুগে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। ধর্মপ্রচারকেরা তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের ভাষায় ধর্মপ্রচার করতেন এবং সেই ভাষাতেই পুস্তক রচনা করতেন। এইভাবে সুলতানী আমলে প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি হয়েছিল। কবীরের দোহা হিন্দী সাহিত্যে একটি অমূল্য রত্ন। সুলতানরা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাংলার হুসেন শাহের সময় পরমেশ্বর দাস 'পাণ্ডব বিজয়' নামে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেন। রামায়ণ অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস। শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বকে বাংলায় অনুবাদ করেন। কাশ্মীরের সুলতান জয়নাল আবেদিনের আমলে ভারতীয় বেদান্ত ও অন্যান্য গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। এই যুগে সায়নাচার্য, মাধবাচার্য, রঘুনন্দন, বোপদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যে বহুগ্রন্থ রচনা করেন।

এ যুগের স্থাপত্য শিল্পে দুই ধর্মের চিন্তাধারার মিলনের আভাস পাওয়া যায়। কতগুলি কারণে এই মিলন সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, মুসলমান সুলতানগণ রাজমিস্ত্রী নিয়ে এদেশে আসেন নি। তারা হিন্দু রাজমিস্ত্রী দিয়ে মসজিদ, প্রাসাদ ও নগর নির্মাণ করান। দ্বিতীয়ত, মুসলমান আক্রমণের প্রথম দিকে হিন্দু এবং জৈন মন্দিরগুলি ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। অনেক সময় মন্দিরগুলিকেই অল্প বিস্তর ভেঙে মসজিদের আকার দেওয়া হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-শিল্পের মিশ্রণ ঘটেছিল সেখানে। আবার দুই ধর্মেরই স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে ছিল অলঙ্করণের প্রবৃত্তি। সুলতানী আমলে স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল দিল্লীর 'কুতুবমিনার' ও 'আলাই দরওয়াজা'; আজমীরে 'আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া'; জৌনপুরে 'অতাল দেবী মসজিদ'; পাণ্ডুয়ায় 'আদিনা মসজিদ' এবং গৌড়ে 'বড় সোনা মসজিদ', 'ছোট সোনা মসজিদ' ও 'কদম রসুল'। হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসাবে ছিল বিজয়নগরের 'বিঠলদেবের মন্দির' ও চিতোরে রাণা কুম্ভের 'বিজয় স্তম্ভ'। এছাড়া এই সময় কিছু নগর নির্মিত হয়েছিল, যেমন কুতুবমিনারের পাশে শিরি নগর, তুঘলকাবাদ, হিসার-ই-ফিরুজ, জৌনপুর, আগ্রা ইত্যাদি। ফিরুজ শাহ কোটলা নামে একটি দুর্গও এই সময় নির্মিত হয়েছিল।

সুলতানী আমলে ইতিহাস রচনা ঃ ইতিহাস রচনায় মুসলমানরা ছিলেন অগ্রণী। এই যুগে আমীর খসরু, মিনহাজউদ্দিন সিরাজ, জিয়াউদ্দিন বারণী, শামসি সিরাজ আফিফ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বহু ইতিহাস রচনা করেন।

সুলতান মামুদ আমলে ভক্তিবাদ : সুলতানী আমলে কয়েকজন মহাপুরুষ প্রচার করলেন এক নূতন ধর্ম, রচনা করলেন দুই জাতি ও দুই ধর্মের মিলনের সেতু। এঁদের ধর্মের মূল কথা ছিল ভক্তি ও প্রেম। তাঁরা প্রচার করলেন ঈশ্বর এক এবং সব ধর্মই সমান। জন্ম নয়, কর্মই মানুষের আসল পরিচয়।

শ্রীচৈতন্যদেব : শ্রীচৈতন্য ছিলেন বৈষ্ণব। তিনি জাতি ভেদ মানতেননা। তাঁর অনেক শিষ্যই ছিল সমাজের নীচু স্তরের মানুষ। তাঁর এক্য শিষ্য যবন হরিদাস ছিলেন মুসলমান। বাংলার হুসেন শাহী যুগে অনাবিল ভক্তির মাধ্যমে তিনি মানুষের ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিয়েছিলেন।



শ্রীচৈতন্যদেব

গুরু নানক : এ যুগে আরেকজন ধর্মগুরু ছিলেন নানক। তিনি জাতিতে "কলু" ব কালোয়ার ছিলেন। বহু মুসলমান তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত



গুরু নানক



কবীর

ছিল হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়। গুরু নানক শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

কবীর ঃ কবীর ছিলেন মুসলমান। তিনি রামানন্দের শিষ্য ছিলেন কবীর বলতেন, 'যিনি রাম তিনি রহিম, যিনি কৃষ্ণ তিনিই করিম'। সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন। উচ্চ নীচে কোন ভেদ নেই।

ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের যুগে বাংলার সমাজ ঃ সুলতানী যুগে বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন অনেক মুসলমান হিন্দু রমণী বিবাহ করেন। মুসলমানগণ অনেকে হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু সাধুদে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমান সাধু ও ফকীরদের শ্রদ্ধা করতে শেখে। হিন্দু ও মুসলমানের এই মেলামেশার ফলে এক নূতন দেবতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই দেবতার নাম সত্যপীর। হিন্দুরা কবরে সিন্নি দিত। মুসলমানরাও গঙ্গাদেবী ওলাদেবী (বিবি), শীতলা মায়ের পূজা আরম্ভ করল। মুকুন্দ রামের **'কবিকঙ্কন চণ্ডী'** থেকে মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

বাংলাদেশের জীবন ছিল কৃষিভিত্তিক। সাধারণ মানুষ ছিল খুব দরিদ্র। কবিকঙ্কন তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে সাধারণ মানুষের অবস্থা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে উচ্চ নীচের প্রভেদ কমে এসেছিল। সমাজের সামান্যজনেরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে মর্যাদা পেয়েছিল।

বাংলা সাহিত্য ঃ মুসলমান সুলতানরা বাংলাভাষার সমাদর করতেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার খুব উন্নতি হয়। কবি মালাধর বসু বারবক শাহের কাছে 'গুণরাজখান' উপাধি পান। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই সময়কারই কবি। নসরৎ শাহ প্রথম মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করিয়েছিলেন। নবদ্বীপ ছিল ন্যায়শাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র। সেখানে বহুসংখ্যক টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। দেশ বিদেশ থেকে ছাত্ররা সেখানে পড়তে আসত।

স্থাপত্য ঃ বাংলার সুলতানরা গৌড় এবং অন্যান্য নগরে বহু মসজিদ ও সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহে তৈরী আদিনা মসজিদ, যদুর সমাধি একলাহী, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, হুসেন শাহের রাজত্বকালে নির্মিত ছোট সোনা মসজিদ, এবং নসরৎ শাহের আমলে গড়া কদমরসুল, বড় সোনা মসজিদ এই সময়ের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

সুলতানী যুগে শাসন ব্যবস্থা : সুলতানী যুগে শাসনব্যবস্থাকে দুটো ভাগে ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—কেন্দ্রিয় শাসন ও প্রাদেশিক শাসন। সুলতান ছিলেন রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি। প্রধান মন্ত্রী ও অন্যানা মন্ত্রীরা প্রশাসনের কাজে সাহায্য করতেন। প্রধানমন্ত্রীকে বলা হত ওয়াজির। অন্য মন্ত্রীদের নাম ছিল দিওয়ান-ই-আরিজ, দিওয়ান-ই-ইনসা, দিয়ান ই-রিসালৎ প্রভৃতি। বিচার ব্যবস্থা ছিল কাজীর হাতে। নগরের নিরাপত্তা রক্ষা করত কোটোয়াল। বাজারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মুহ্‌তাসিব্‌ নামে একজন কর্মচারী ছিল। সুলতানের গুপ্তচরবিভাগ জনসাধারণের গতিবিধির ওপর নজর রাখত। জনগণের কাছ থেকে উষর, খারাজ, খাম ইত্যাদি কর আদায় করা হত। ব্যবসা বাণিজ্য থেকেও কিছু কর আদায় হত। হিন্দুদের উপর চাপানো হয়েছিল জিজিয়া কর। রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ছিল এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী। পদাতিক, তীরন্দাজবাহিনী, অশ্বারোহী এবং হস্তীবাহিনী এই সামরিকবাহিনীতে ছিল। রাজদরবার ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। প্রশাসনের ধরণ ছিল মধ্য এশিয়া থেকে আমদানী করা কিছু প্রাচীন ভারতীয় রীতির মিশ্রণ।

সংক্ষিপ্তসার ভারতে অভ্যন্তরে প্রথম স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন কুতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬ খ্রীঃ)। ১৩০৬ সাল থেকে ১৫২৬ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত যে কাল তাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতানী যুগ বলা হয়। এই ৩২০ বছরে পাঁচটি রাজবংশ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। দাশবংশ, খিলজীবংশ, তুঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ এবং লোদী বংশ।

সুলতানী আমলে রাষ্ট্র ছিল ধর্মভিত্তিক। রাজনীতিতে হিন্দুদের কোন বড় ভূমিকা ছিল না বললেই হয়। সুলতনী যুগের কয়েকজন বিদেশী ভ্রমণকারী এবং কবি ও ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। কৃষি ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি। বয়ন শিল্প ছিল প্রধান শিল্প। সুলতানী যুগে ইসলাম ও ভারতীয় সভ্যতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। দুই সভ্যতার মাঝে এক মিলনের সুর দেখা দিয়েছিল। শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্ম সর্বক্ষেত্রেই এই সমন্বয় দেখা যায়। সুলতানী আমলে কয়েকজন মহাপুরুষ দুই জাতি ও দুই ধর্মের মিলনের সেতু রচনা করে প্রচার করলেন এক নূতন ধর্ম। এদের ধর্মের মূল কথা ছিল ভক্তি ও প্রেম।

সুলতানী যুগে রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন সুলতান। প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রশাসনের কাজে সাহায্য করতেন। জনগণের কাছ থেকে নানাবিধ কর আদায় করা হত। হিন্দুরা অতিরিক্ত দিত জিজিয়া কর।

অনুশীলনী

১। সুলতানী আমলে রাজনৈতিক জীবনের একটি বিবরণ দাও। এই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কথা আমরা কাদের থেকে জানতে পারি? সাধারণ লোকের অবস্থা কি রকম ছিল।

২। সুলতানী যুগে ইসলাম ও ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ের কয়েকটি নিদর্শন দাও। রামায়ণ কে অনুবাদ করেন? এ যুগের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনগুলির নাম লিখ?

৩। ভক্তিবাদ কি? এই সময়কার তিনজন মহাপুরুষের নাম লেখ। তাঁদের ধর্মের মূল কথা কি ছিল?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। উর্দু ভাষার উদ্ভব কি ভাবে হয়েছিল?
২। 'পদ্মিনী' কে রচনা করেছিলেন?
৩। মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' কে বাংলায় অনুবাদ করেন?
৪। 'আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া কোথায় আছে?
৫। ওয়াজির কাকে বলা হত?

শূণ্যস্থান পূর্ণ কর—

১। '—— ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি।
২। কবীরের——হিন্দি সাহিত্যে একটি অমূল্য রত্ন।
৩। হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসাবে ছিল বিজয়নগরের—— মন্দির ও চিতোরের রাণা কুম্ভের——
৪। ইতিহাস রচনার মধ্যে বারণীর——বিখ্যাত।

চতুর্দশ অধ্যায়

অবসানের পথে মধ্যযুগ

(চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী)

[কনস্টান্টিনোপলের পতন (১৪৫৩ খ্রীঃ) ; রেনেশাঁস বা নবজাগরণ ; নবজাগরণের যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ; ভৌগোলিক আবিষ্কার ; জাতীয় রাষ্ট্র ; নেদারল্যাণ্ডসের জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই ; বহির্বিশ্বে ইয়োরোপের বিস্তার ; পুরাতনের সাথে পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব ।]

কোন যুগ হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে আরেকটি যুগের সূচনা করে না। যুগ থেকে যুগান্তরের ইতিহাস চলে তার নিজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতার মাঝেও কিছু ঘটনা পরিবর্তনের দিকচিহ্ন হয়ে দেখা দেয়। তাদের বুঝতে না পারলে ইতিহাসের ধারাকে বোঝা যায় না।

কনস্টান্টিনোপলের পতন (১৪৫৩ খ্রীঃ) মধ্যযুগের অবসান পর্বের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সম্রাট দ্বিতীয় মহম্মদের হাতে শেষ বাইজানটাইন বা পূর্ব রোমান সম্রাট একাদশ কনস্টান্টাইনের পরাজয় এবং তুর্কীদের হাতে বাইজানটাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতন। এতদিন ধরে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ছিল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বিভাজক রেখা, পূর্বদিকে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় প্রহরী। এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটার ফলে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী যাজক, পণ্ডিত এবং অনেক সাধারণ মানুষ পুঁথি-পত্র ও অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে পশ্চিমে ইটালী প্রভৃতি দেশে পালিয়ে যান। বেশ কিছুকাল ধরেই সেখানে বিদ্যাশিক্ষার জলতরঙ্গ চলছিল। এবার এই নূতন মানুষের জোয়ার এসে বিদ্যা শিক্ষার এই প্রবণতায় নূতন উৎসাহ এনে দেয়। এই ঘটনাই ইয়োরোপের ইতিহাসে নবজাগরণ (Renaissance) নামে বিখ্যাত। তাছাড়া বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের ফলে স্থলপথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তখন জলপথে পৃথিবীর পূর্বখণ্ডকে আবিষ্কার করার চেষ্টা আরম্ভ হয়। সংস্কৃতিক নবজাগরণের ও ভৌগোলিক

আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে বহির্বিশ্বকে জানা—এই দুই ঘটনার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের জন্ম হয়।

রেনেশাঁস বা নবজাগরণ : ইয়োরোপের নবজাগরণের মূল কেন্দ্র ছিল ইটালী। সেখান থেকে আল্পস্ পাহাড় পেরিয়ে নবজাগরণের ধারা পেঁছেছিল পশ্চিম ইয়োরোপে। ইটালীর ফ্লোরেন্স, মিলান, জেনোয়া, নেপলস্, ভেনিস প্রভৃতি শহরে সামন্ত শাসন অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এই শহরগুলিতে অনেক দিন ধরেই ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও শিল্পের চর্চা স্বাধীনভাবে চলছিল। একাদশ শতাব্দী থেকেই জার্মান আইনের বদলে রোমান আইনের চর্চা এবং আরও কিছুকাল পরে ল্যাটিন ভাষাকে বর্জন করে ইটালীয় ভাষায় রচিত দান্তের 'ডিভাইন কমেডি', পেত্রার্কের কবিতা এবং বোকাচিওর 'ডেকামেরণ' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ এই নবজাগরণের সূচনা করেছিল।

নবজাগরণ মানুষকে দিয়েছিল ধর্মের বাইরে এক নূতন অনুসন্ধিৎসা, এক বিচারবোধ ও তার সাথে এক মানবমুখী দর্শন। বুদ্ধি দিয়ে বোঝার, অন্ধভাবে কিছু মেনে না নেওয়ার এই কোণকে বলা হয় নবজাগরণের চেতনা (Renaissance Spirit,। এই চেতনা ছিল বলে নবজাগরণ ইয়োরোপের জ্ঞানোন্মেষের সহায়তা করতে পেরেছিল। নবজাগরণের জ্ঞানকে যিনি মূর্ত করেছিলেন তিনি হলেন বিখ্যাত ওলন্দাজ পণ্ডিত ইরাসমাস (Erasmus)। রাষ্ট্রদর্শনে নবজাগরণের প্রতিভু ছি'লন 'দ্য প্রিন্স গ্রন্থের রচয়িতা ম্যাকিয়াভেলি, সাহিত্য-এর প্রতিভু ছিলেন 'ডনকুইক্‌জোট' রচয়িতা সারভ্যানটেস (Cervantes), 'ক্যান্টারবেরি টেলস্'-এর লেখক চসার এবং ইংরাজি ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়র।

নবজাগরণের যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার : ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে গুটেনবার্গ নামে এক মুদ্রাকর ধাতুনির্মিত চলন্ত হরফ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব অসাধারণ কারণ তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে ত্বরান্বিত করল। নবজাগরণের যুগেই কোপারনিকাস আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। গ্যালিলিও তাঁর নূতন টেলিস্কোপ দিয়ে আবিষ্কার করলেন যে সূর্যও স্থিতিশীল নয়, সেও ঘূর্ণমান। এছাড়া

মার্কেটর নামে এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞান ভিত্তিক মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি, গিলবার্ট আবিষ্কার করলেন পৃথিবী চৌম্বকত্বের তত্ত্ব, কেপলার রচনা করলেন তাঁর সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং ভেসালিয়াস নামে এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন মানুষের শরীরের গঠনতন্ত্র। এসবের সাথেএই সময় আবিষ্কৃত হয়েছিল জলশক্তির দ্বারা চালিত ইঞ্জিন (Hydraulic Engine), বায়ু-চুল্লি (Blast Furnace) এবং মাটি থেকে উপরে জল তোলার পাম্প। অত্যন্ত সাধারণ তথ্যের উপর নির্ভর করে এই সব আবিষ্কৃত হয়েছিল।



প্রথম দিকের মুদ্রাযন্ত্র

ভৌগোলিক আবিষ্কার : নবজাগরণ ভৌগোলিক আবিষ্কারকেও উৎসাহ দিয়েছিল। তাছাড়া কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর যখন স্থলপথে প্রাচ্যে আসার পথ বন্ধ হয়ে গেল তখন জলপথে বহির্বিশ্বকে আবিষ্কারের চেষ্টা আরম্ভ হল। এরই ফলে ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক বারথ-লোমিউ দিয়াজ আফ্রিকার দক্ষিণের অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে আসেন। ১৪৯২ সালে স্পেনের নাবিক কলম্বাস চীনে যাবার পথে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে আমেরিগো ভেসপুচি নামে এক ইটালীয় নাবিক সর্ব প্রথম আমেরিকার মাটিতে উপনীত হলেন। ১৫০০ সালে কেব্রেল নামে এক নাবিক ব্রেজিল আবিষ্কার করেন। এর কিছুকালের মধ্যে ম্যাজেলান আবিষ্কার


কলম্বাস

করেন প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। কার্টেজ আবিষ্কার করেন মেক্সিকো আর পিজারো আবিষ্কার করেন দক্ষিণ আমেরিকার পেরু। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক ভারতবর্ষের অন্তর্গত কালিকট বন্দরে এসে পেঁছান। এইভাবে বহির্বিশ্ব ইয়োরোপের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। আরম্ভ হয় পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাণিজ্যের সূত্র ধরে শুরু হয় প্রাচ্যের দুর্বল দেশগুলিতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার লড়াই। এর সাথে সাথে দেখা দিল দুর্বল দেশগুলিকে শোষণের চেষ্টা, ক্রীতদাস ব্যবসা ও খ্রীষ্টধর্মের প্রসার। সামুদ্রিক বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে ইয়োরোপের শিল্প, পরিবহন রাস্তাঘাটের উন্নতি হতে লাগল। উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল নিয়ে সেখানকার বাজারে নিজেদের পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের প্রচেষ্টাও দেখা দিল। ইয়োরোপের নূতন বণিক ও মধ্য শ্রেণীর উদ্ভব হল। দেখা দিল নূতন যুগ। এই যুগই হল পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্বময় সাম্রাজ্যবাদের ও ইয়োরোপে ধনতন্ত্রের সূচনার যুগ।



ভাস্কো-ডা-গামা

জাতীয় রাষ্ট্র ঃ মধ্যযুগের অবসানপর্বে ইয়োরোপের একটি বড় ঘটনা হল জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে রাজার ক্ষমতা বিলীন হয়ে গিয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে আবার শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতাকে খর্ব করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে আবার নিরঙ্কুশ গরিমায় রাজতন্ত্র অধিষ্ঠিত হতে থাকে। ইংলণ্ডে নর্মান রাজারা —উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার, দ্বিতীয় হেনরী, রিচার্ড দ্য লায়ন হার্টেড ক্রুসেডার ইত্যাদি রাজারা—এবং ফ্রান্সে ক্যাপেসিয়ান রাজারা এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে তোলেন। স্পেনে রাজা ফার্দিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলা এই রকম শক্তিশালী রাজতন্ত্র গঠন করেছিলেন। টিউডর (Tudor) রাজাদের সময় ইংল্যাণ্ডের জাতীয় রাষ্ট্র পরিপূর্ণ রূপ পায়। মধ্যযুগের রাষ্ট্র-

ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতি প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। এবার বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন জাতি তাদের স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পেল।

নেদারল্যাণ্ডস্ : জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে নেদারল্যান্ডস্ শক্তিশালী স্পেনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এতদিন ধরে নেদারল্যান্ডসের কৃষক, কারিগর ও সাধারণ মানুষেরা দেশের সামন্ত প্রভু ও ধর্মযাজকদের দ্বারা শোষিত হত। এবার তারা স্পেনের শাসকদের দ্বারা শোষিত হতে লাগল। ১৫৬৬ সালে নেদারল্যান্ডসের কৃষক মজুর ও সাধারণ মানুষ এই দেশীয় ও বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু বিদেশী শাসকরা দেশীয় প্রভুদের সাথে হাত মিলিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে। ১৫৭৯ সালে আবার উত্তর নেদারল্যান্ডসে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহই ইয়োরোপের ইতিহাসে নেদারল্যান্ডসের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম নামে বিখ্যাত। এই বিদ্রোহকে দমন করা সহজ হয়নি। বিদ্রোহ সাধারণ মানুষ তাদের দেশের নূতন নামকরণ করেন প্রজাতান্ত্রিক হল্যান্ড। ১৬০৯ সালে স্পেন নেদারল্যান্ডস্‌কে স্বাধীনতা দান করে। নেদারল্যান্ডসে জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই সফল হয়।

বহির্বিশ্বে ইয়োরোপের বিস্তার : ভৌগোলিক আবিষ্কারে একটা বড় ফল হল এই যে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ ইয়োরোপের বাইরে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করল। এবিষয়ে অগ্রণী দুটি দেশ হল স্পেন ও পর্তুগাল। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপের ধর্মগুরু পোপ উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত একটি কাল্পনিক রেখা টেনে ঘোষণা করলেন যে এই রেখার পূর্বদিকে পর্তুগালের এবং পশ্চিম দিকে স্পেনের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থাকবে। এই সুযোগ গ্রহণ করে স্পেন আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজের উপনিবেশ গড়ে তুললো ফ্লোরিডা নিউ মেক্সিকো, ক্যালিফোর্ণিয়া, মেক্সিকো বাদ দিয়ে পুরো দক্ষিণ আমেরিকার উপর স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, পর্তুগালের সাম্রাজ্য ছিল গোয়া, মালাক্কা ও ব্রেজিলে। তাছাড়া এশিয়ার জলপথে পর্তুগীজরা দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করল। এই সব উপনিবেশগুলি থেকে বিপুল পরিমাণে সোনারুপা ইয়োরোপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিছুদিন মধ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স হল্যান্ডও বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারে

মন দিল। ওলন্দাজরা সিংহল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ায় এবং ফরাসীরা উত্তর আমেরিকার কানাডা প্রভৃতি অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করল।

পুরাতনের সাথে পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব: একটি যুগ যখন শেষ হয় তখন জীর্ণ হয়ে আসা পুরাতন ব্যবস্থার সাথে পরিবর্তনের সংঘাত হয়। নগরের উদ্ভব, বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বণিক ও মধ্যশ্রেণীর উত্থান, কৃষির সাথে কুটীর শিল্পের বিচ্ছেদ, নগরে উঠে আসা কারিগর, গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা কৃষক ও সার্ফ, ক্রমক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণী ও নব্যরাজতন্ত্র—এ সমস্ত কিছুই সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের সূচনা করছিল। অন্যদিকে নবজাগরণের ফসল নূতন অনুসন্ধিৎসা, বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার, নূতন জ্ঞানোন্মেষ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভেতর থেকে আহরণ করা সোনারূপা ইত্যাদি ঐশ্বর্যের আকর্ষণ, স্বদেশের বিদেশের নূতন বাজার, সহজলভ্য ক্রীতদাসদের শ্রম—এ সমস্ত কিছুই এক নূতন যুগের ইংগিত বহন করে আনছিল। ইতিহাসের সামন্তপর্ব জমিকে আশ্রয় করে নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকার যুগ শেষ হয়ে দেখা দিচ্ছিল দিকে দিকে দেশে দেশে আত্মপ্রসারণের যুগ। কিন্তু সামন্ত প্রভুরা তা বুঝতে পারেননি, আর পারেননি বলেই সংঘাত হয়ে উঠেছিল অনিবার্য।

এই অনিবার্য সংঘাত বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠল ১৩৮১ সালে ইংল্যান্ডে ওয়াট টাইলর নেতৃত্বে ধর্মযাজক ও সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ। ধর্মযাজক ও সামন্ত প্রভুরা চেয়েছিলেন পুরোনো কায়দায় কৃষকদের শোষণ করে বেঁচে থাকতে। কৃষকরা চেয়েছিল সামন্ত কর-ব্যবস্থার অবসান, চেয়েছিল বাঁচার অধিকার। কৃষকদের এ বিদ্রোহকে দমন করা হয়েছিল কিন্তু তাদের দাবিকে পূরণ করা হয়নি। কৃষকদের সংগ্রাম নিষ্পেষিত হলেও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়নি। সনাতনের সাথে পরিবর্তনের সংঘাত থেকে ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটিত হয়। সামন্ত প্রভুরাও বুঝতে পেরেছিলেন যে জুলুম করে কৃষকদের বেগার খাটিয়ে আর তারা নিজেদের বৈভবকে টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। এর পর থেকে ইজারাদারদের হাতে তাঁদের জমি তাঁরা ছেড়ে দিলেন, কৃষকদের ভাড়া করা শ্রমে চলতে লাগল কৃষিকাজ। জমির সাথে সাথে নিরবিচ্ছিন্ন বন্ধনের যুগ শেষ হল। অন্যদিকে লুঠ করে আনা উপনিবেশের দৌলত ও

বিদেশী বাজারের চাহিদা সমাজের অর্থনীতিকে নূতন করে বদলে দিতে লাগল। প্রভুর জুলুম আর জমির বন্ধন—এই দুইয়ের সাথে মধ্যযুগ তলিয়ে গেল। অন্যদিকে সম্প্রসারণশীল ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী দামামায় বেজে উঠল প্রত্যাসন্ন নূতন যুগের আত্মঘোষণা।

সংক্ষিপ্তসার : মধ্যযুগের অবসান পর্বের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজানটাইন সাম্রাজের পতন। মধ্যযুগের পরে আধুনিক যুগের জন্ম হয় দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে, সংস্কৃতিক নবজাগরণ ও ভৌগোলিক আবিষ্কার।

ইয়োরোপের নবজাগণের মূল কেন্দ্র ছিল ইটালী। নবজাগরণ মানুষকে দিয়েছিল ধর্মের বাইরে এক নূতন অনুসন্ধিৎসা, এক বিচারবোধ ও তার সাথে এক মানবমুখী দর্শন। বুদ্ধি দিয়ে বোঝায়, অন্ধভাবে কিছু মনে না নেওয়ার দৃষ্টি কোণকে বলা হয় নবজাগরণের চেতনা।

নবজাগরণের যুগে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এবং ভৌগোলিক আবিষ্কার হয়। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বহির্বিশ্ব ইয়োরোপের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়।

মধ্যযুগের অবসানপূর্ব ইয়োরোপের একটি বড় ঘটনা হল জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। মধ্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতি প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। এবার বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন জাতি তাদের স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পেল।

চারিদিক থেকে এসেছিল এক পরিবর্তনের জোয়ার। এই পরিবর্তনের সাথে পুরাতনের স্বন্দেব সামন্ততন্ত্রের বিদায়ের যুগ ঘনিয়ে এসেছিল। জমির সাথে নিরবচ্ছিন্ন বন্ধনের যুগের শেষের সাথে মধ্য যুগও শেষ হয় গেল।

অনুশীলনী

১। নবজাগরণ কাকে বলে? নবজাগরণের ফল কি হয়েছিল।
২। মধ্যযুগের শেষের দিকে ভৌগলিক আবিষ্কারগুলি বর্ণনা কর।
৩। নেদারল্যাণ্ডসের জাতীয় স্বাধীনতা ও ইংরেজ বিদ্রোহ বর্ণনা কর।
৪। মধ্যযুগ কিভাবে শেষ হল?

একটি বাক্যে উত্তর দাও—

১। কি কি দুই ঘটনার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে জন্ম হয়?
২। ইয়োরোপের নবজাগরণের মূল কেন্দ্র কোনটি ছিল?
৩। কোপারনিকাশ কি আবিষ্কার করেন?
৪। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় রাষ্ট্র কোন্ রাজাদের আমলে পরিপূর্ণ রূপ পায়?
৫। ইংল্যাণ্ডে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব কে দেন?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

১। রাষ্ট্র দর্শনে নবজাগরণের প্রতিভূ ছিলেন ——।
২। ডন কুইজোট রচনা করেছিলেন ——।
৩। গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেন ——।
৪। সূর্য্যগ্রহন সংক্রান্ত তত্ত্ব রচনা করেন ——।
৫। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে——ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে এসে পৌছান।

——

(ক)

শতাব্দীর পরিক্রমা

পঞ্চম শতাব্দী : পশ্চিম ইয়োরোপে রোমান রাজত্বের অবসান ; ভারতের হূণ আক্রমণ

ষষ্ঠ শতাব্দী : জাস্টিনিয়ান ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

সপ্তম শতাব্দী : হর্ষবর্ধন ; মহম্মদ

অষ্টম শতাব্দী : শার্লমান ; হারুণ-অল-রশীদ

নবম শতাব্দী : ধর্মপাল ; পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্ব

দশম শতাব্দী : গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

একাদশ শতাব্দী : সুলতান মামুদ ; সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, 'ক্রুসেড'

দ্বাদশ শতাব্দী : মহম্মদ ঘুরী ; সালাদিন

ত্রয়োদশ শতাব্দী : ইলতুৎমিস ; বলবন

চতুর্দশ শতাব্দী : আলাউদ্দিন ; মহম্মদ তুঘলক

পঞ্চদশ শতাব্দী : কনস্টান্টিনোপলের পতন ; হুসেন শাহ ; চৈতন্যদেব

মধ্যযুগ : পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী (বর্ষ ও ঘটনাপঞ্জী)

তারিখ খৃষ্টাব্দ	ইয়োরোপ	ভারতবর্ষ	চীন ও জাপান	পশ্চিম এশিয়া
৩৯৫	বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সূচনা			
৪১০	অ্যালারিকের রোম লুন্ঠন			
৪৫১	অ্যাটিলার ফ্রান্স আক্রমণ ও পরাজয় ইটালী আক্রমণ			
৪৫৩	অ্যাটিলার মৃত্যু			
৪৫৫-৬৭		স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল		
৪৭৬	পশ্চিম ইয়োরোপে রোমান শাসনের অবসান			
৪৮৬	গলদেশে ফ্রাংকদের রাজ্যস্থাপন			
৫২৭-৬৫	জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকাল			
৫৭০-৬৩২				হজরত মহম্মদ
৬২২				হিজরি সনের আরম্ভ
৬০৬-৪৭		হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল		
৬২৯-৪৩		হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ		
৬৪৫-৬৫০			জাপানের মহান সংস্কার কার্য	
৭১২-১৩		আরবদের সিন্ধুদেশ আক্রমণ ও বিজয়		
৭১৮-৯০৭			চীনের তাং বংশের রাজত্বকাল	
৭৬৮-৮১৪ ৮০০	শার্লমানের রাজত্বকাল শার্লমানের অভিষেক			
৭৮৬-৮০২				হারুণ-অল-রশীদের রাজত্বকাল

তারিখ খ্রীষ্টাব্দ	ইয়োরোপ	ভারতবর্ষ	চীন ও জাপান	পশ্চিম এশিয়া
৯৬০-১২৮০			চীনে সুং বংশের রাজত্বকাল	
৯৯৮-১০৩০		সুলতান মামুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ		
১০৯৫	ক্রুসেডের আরম্ভ			
১০৯৯	ক্রুসেডারদের জরুজালেম বিজয়			
১১৭৫-১২০৬		মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান		
১১৮৭	সালাদিন কর্তৃক জেরুজালেম পুনরাধিকার			
১১৮৯-৯৩	বারাবারোসা রিচার্ড ও ফিলিপ অগাস্টাসের ক্রুসেড			
১২০৬		দাস বংশের প্রতিষ্ঠা		
১২৮০-১৩৬৮			চীনে ইউয়ান যুগ	
১২৮০-১২৯৪			কুবলাই খাঁর শাসনকাল	
১২৯৬-১৩১৬		আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকাল		
১৩২৫-৫১		মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকাল		
১৩৫১-৮৮		ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকাল		
১৪৫৩	বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অবসান			
১৪৯৩		বঙ্গদেশে হুসেন শাহের সিংহাসন আরোহণ		